

নেহরু বাল পুস্তকালয়

যেসব আবিষ্কারে দুনিয়া পালটে গেছে

দ্বিতীয় খণ্ড

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

যেসব আবিষ্কারে দুনিয়া পালটে গেছে

(দ্বিতীয় খণ্ড)

মীর নজাবৎ আলি

অনুবাদ

সুনীল কান্তি ধর

ছবি

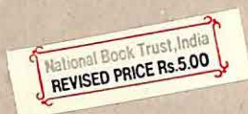
আহামদ



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নয়াদিল্লি

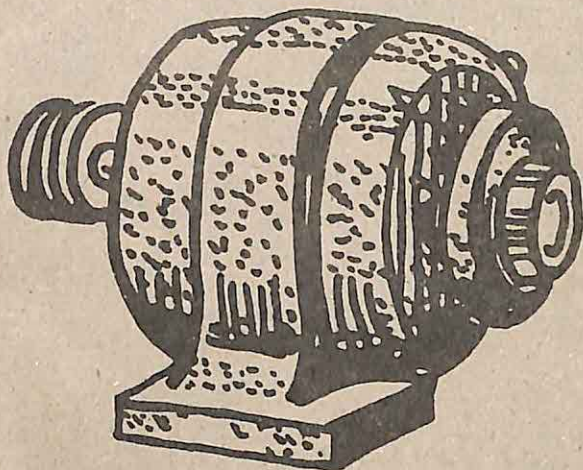
1974 (*Saka* 1896)
Reprinted 1982 (*Saka* 1904)
Reprinted 1986 (*Saka* 1908)



মূল রচনা : ইনভেনশনস্ হ্যাট চেনজড্ দি ওয়ার্লড
(ইংরেজি)

INVENTIONS THAT CHANGED THE WORLD—II
(Bengali)

Published by the Director, National Book Trust, India, A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed at Saraswati Art Printers, 8247/2 New Anaj Mandi, Delhi-110006



ডায়নামো

যে কোন দেশে বিদ্যুৎশক্তির প্রাচুর্য মহাসম্পদ। ঘরে ঘরে আলো ও উত্তাপ সরবরাহ ছাড়াও দৈনন্দিন ব্যবহারের অনেক যন্ত্রপাতি বিদ্যুতে চলে। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, টোষ্টার, উনুন, ঘন্টি, রেফ্রিজারেটার, ক্লীনার, কুলার, কাপড় কাচার ও দাড়ি কামাবার যন্ত্র ইত্যাদি কতরকম জিনিস আমরা রোজ



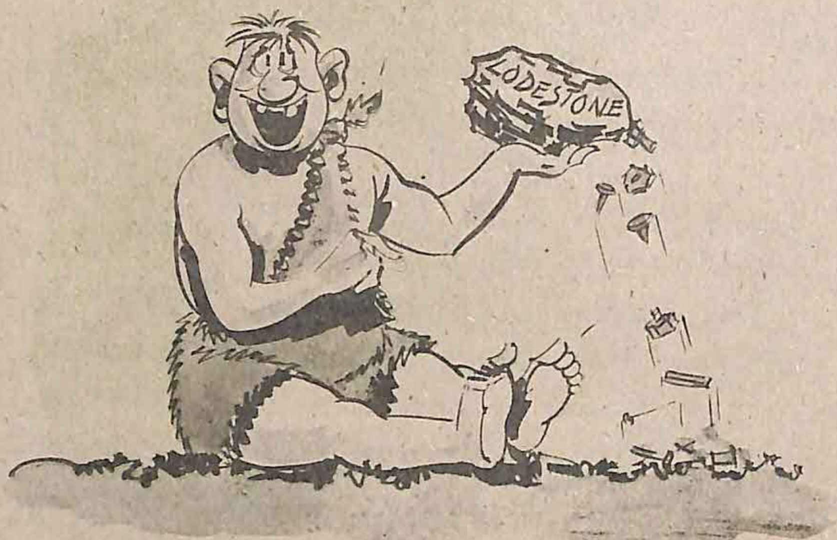
ব্যবহার করছি। আর এতে আমাদের জীবনযাত্রা কত সহজ ও সুখের হয়েছে।

কারখানার যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ী ও ট্রাম চালাতে বিদ্যুৎশক্তি কাজে লাগাই। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও এবং টেলিভিশনও বিদ্যুতের অবদান। আজকাল এত কাজে আমরা বিদ্যুতের ব্যবহার করি যে এক সময় বিদ্যুতের প্রয়োগ আমাদের জানা ছিল না এটা ভাবতে যেন অবাক লাগে।

দেড়শ' বছর আগেও বিদ্যুৎশক্তি ছাড়াই সব কাজ করতে হ'ত ; কারণ তখন বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যুৎ তৈরী করা ছিল দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য। শুধু বৈজ্ঞানিকরা গবেষণার জন্যে অল্প-স্বল্প বিদ্যুৎ তৈরী করতেন। বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপাদন-যন্ত্র ডায়নামোর আবিষ্কারই বিদ্যুৎশক্তিকে প্রথম সাধারন মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দেয়।

বিদ্যুতের অস্তিত্বের কথা বহুকাল আগেই জানা ছিল। খৃষ্টপূর্ব 600 বছর আগে এক গ্রীক দার্শনিক আবিষ্কার করেন যে তৈল স্ফটিককে (amber) সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষলে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়। কাছের যে কোন হাল্কা জিনিষ যেমন কাগজ, পালক বা কাপড়ের টুকরোকে সেটা কাছে টেনে নেয়। ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক হ'লেও এই নিয়ে সত্যিকারের গবেষণার কাজ 1600 খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি উইলিয়াম গিলবার্ট আরম্ভ করেন। প্রথমটাতে এটা ছিল তাঁর সখের খেয়াল। কাজও শুরু করেন সেভাবে। কিন্তু শেষ অবধি অনেক যত্ন নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি দেখতে পেলেন, অ্যাম্বার ছাড়াও গন্ধক, কাঁচ বা গালাকে সিল্ক, ফ্লানেল বা পশুলোম দিয়ে ঘষলে এরা কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে। 'ইলেক্ট্রিসিটি' শব্দটির ব্যবহারও তিনিই চালু করেন। কেননা গ্রীক ভাষায় অ্যাম্বারকে বলা হয় ইলেক্ট্রন। এভাবেই আধুনিককালের বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের সূচনা, পরবর্তীকালে যা পৃথিবীর চেহারাটাকেই পালটে দেয়।

বিদ্যুৎ আবিষ্কারেরও আগে গ্রীকরা দেখলেন যে এক ধরণের পাথর লোহার টুকরো আকর্ষণ করে। এই পাথর অম্লজানযুক্ত লোহা বিশেষ যা প্রাকৃতিক অবস্থায় গ্রীস, উত্তর আমেরিকা ও সুইডেনে পাওয়া যায়। এই প্রস্তর ধাতুটি

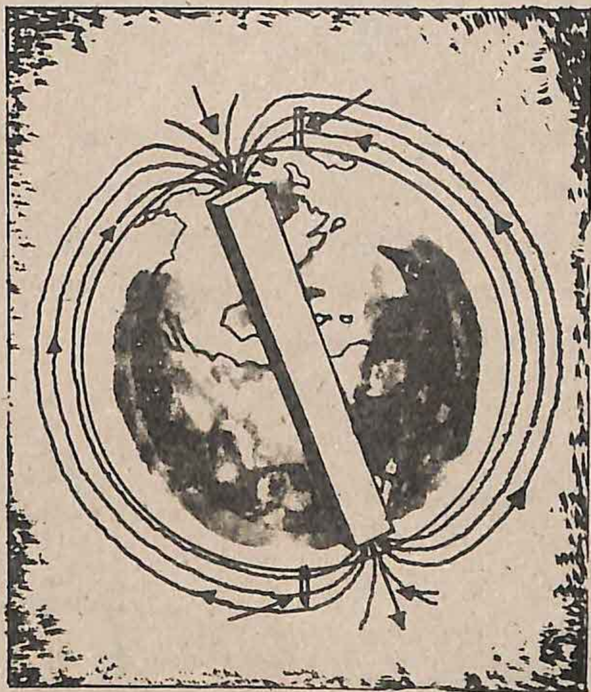


গ্রীসের ম্যাগনেশিয়া অঞ্চলে প্রথম দেখা যায় বলে একে ম্যাগনেশিয়া পাথর বলা হ'ত। এর থেকে ম্যাগনেট বা চুম্বক শব্দটির সৃষ্টি।

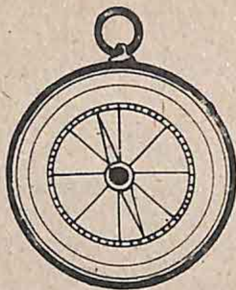
বর্ত্তমানে বিদ্যুতের সাহায্য কৃত্রিম চুম্বক তৈরী করা হয়। কৃত্রিম চুম্বক দুই রকমের, দণ্ডাকৃতি বা অশ্বক্ষুরাকৃতি। অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক দেখতে ইংরেজী

'ইউ' অক্ষরের মত। এই দুই রকমের চুম্বকই অনেক কাজে লাগে। দণ্ডাকৃতি চুম্বক দিয়ে নাবিকরা দিক্‌নির্ণয় করে।

দণ্ডাকৃতি চুম্বককে একটা সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে সেটা সব সময় উত্তর-দক্ষিণমুখো হয়ে থাকে। এই আবিষ্কারের আগে নাবিকদের পক্ষে



দোদুল্যমান চুম্বক উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্ণয় করে


কম্পাস

সমুদ্রপথে সঠিক দিক নির্ণয় করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। মাঝ দরিয়ায় সব দিকই একরকম দেখতে। তাই সূর্য্য, চাঁদ বা তারা দেখে দিক ঠিক করে জাহাজ চালাতে হ'ত। কিন্তু অনেক সময় দিনের পর দিন তারা, চাঁদ, এমনকি সূর্যও মেঘে ঢাকা পড়ে যেত। চুম্বক সবসময় উত্তর দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। তাই চুম্বক আবিষ্কারের ফলে নাবিকরা এটাকে কম্পাস হিসেবে ব্যবহার করে দেখতে পেল যে কোন সময়ে তারা জাহাজের দিক নির্ণয় করতে সক্ষম।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে বিজ্ঞানের অভ্যুদয়। গিলবার্টের কাজে অনুপ্রেরণা পেয়ে বৈজ্ঞানিকরা বিদ্যুৎ ও চুম্বকের বিষয়ে আরও গবেষণা করেন। এর ফলে বিদ্যুৎ তৈরী করবার যে যন্ত্র এবং বিদ্যুৎ ধরে রাখবার যে আধারের আবিষ্কার হয় তাদের বলা হয় লীডেন জার (Leyden jar) এবং উইমস্হার্স্ট (Wimshurst) মেসিন।

দুইটি বস্তুর ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে বলা হয় ঘর্ষবিদ্যুৎ (frictional electricity)। এই বিদ্যুৎ কাজে লাগানো সহজ নয়, তাই এর উপযোগিতাও কম। বেশী পরিমাণে এই বিদ্যুৎ সঞ্চয় করলে এটা কোন শূন্য স্থান পেরিয়ে গিয়ে স্ফুলিঙ্গ


লীডেন জার

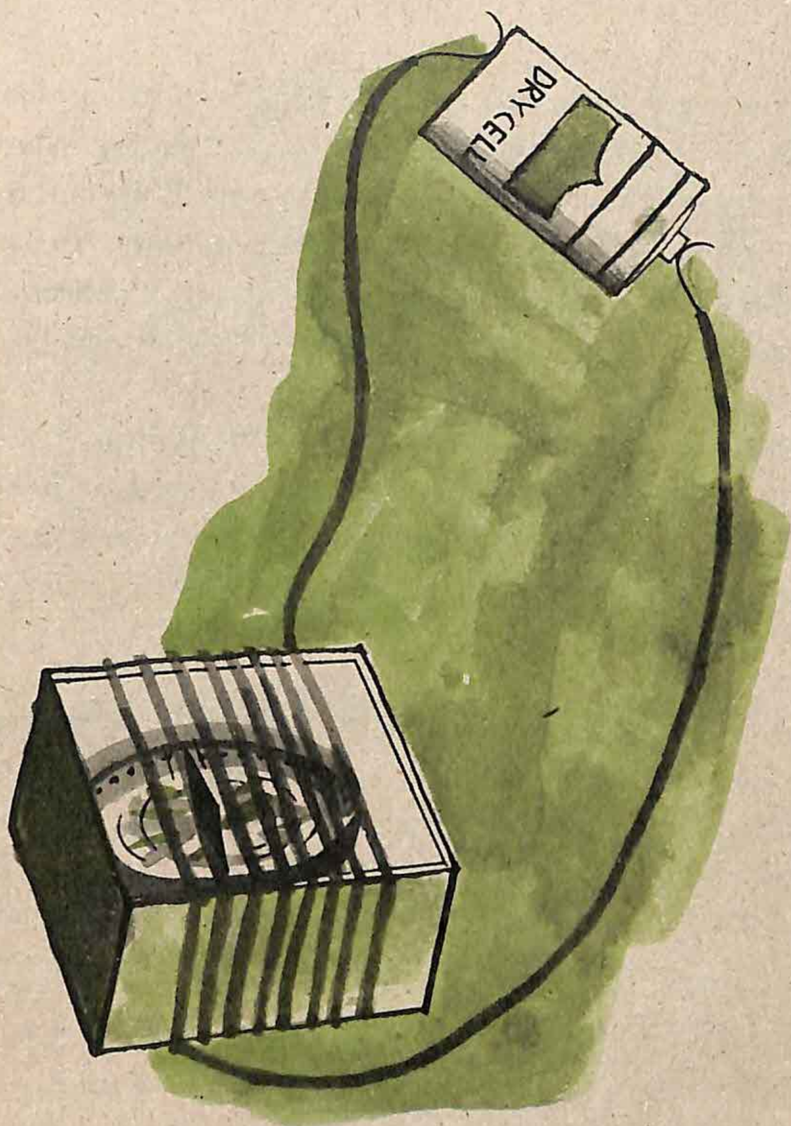


সৃষ্টি করতে পারে। এই বিদ্যুৎ একটা আধারে সঞ্চয় করা সম্ভব হলেও এর নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ সম্ভব নয়।

বিদ্যুৎ বিষয়ে প্রথম দিকের গবেষকদের ভেতর 1752 খৃষ্টাব্দে সব চাইতে চমকপ্রদ আবিষ্কার ঘটে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের হাতে। ইনি দেখেন যে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ আর আকাশে বিদ্যুতের চমক সমধর্মী।

বিদ্যুতের অবিরত প্রবাহের সৃষ্টি এখন সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডায়নামোর আবিষ্কারে। এতে বিদ্যুতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

1789 খৃষ্টাব্দে ইতালীর এনাটমির অধ্যাপক লুইগি গ্যালভানি গবেষণার টেবিলে বিচ্ছিন্ন করা ব্যাঙের স্নায়ুতে দৈবক্রমে একটি ইস্পাতের যন্ত্র ঠেকালে ব্যাঙের পা-টা জোরে নড়ে ওঠে। ব্যাঙের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তামার শিকে গেঁথে লোহার রডে ঝুলিয়ে রাখলেও এই রকমের সঞ্চালন দেখা যায়। গ্যালভানি ভেবেছিলেন যে জীবদেহে বিদ্যুৎ থাকাতে স্নায়ুতে দস্তার কাঠি দিয়ে ছুঁলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেঁপে ওঠে। মাংসপেশীতে দস্তার সংস্পর্শে তামার কাঠি দিয়ে ছুঁলেও এই ধরণের কম্পন দেখা যায়। একে বলা হয় জৈব বিদ্যুৎ বা গ্যালভানিজ্‌ম। কিন্তু আরেকজন ইতালীয় অধ্যাপক আলেক্‌জাণ্ড্রো ভলটা এই তথ্য মেনে নিতে পারেন নি। ওঁর বিশ্বাস ছিল জীবদেহে কোন বিদ্যুৎ থাকে না। দুইটি বিভিন্ন ধাতুর সংযোগে ভেজা মাংসপেশীতে বিদ্যুতের সৃষ্টি ইনি কতকগুলি দস্তা ও তামার চাক্‌তি পরপর সাজিয়ে এগুলোর মাঝে লবণ জলে ভেজানো পিচ বোর্ড রাখেন। এই থাকের দুই প্রান্ত জুড়ে দিয়ে ইনি বিদ্যুতের সৃষ্টি করেন। একে বলা হয় ভল্‌টায়িক সেল। এই থেকে বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সৃষ্টি হয়। পরে আরও উন্নত ধরণের বৈদ্যুতিক সেল তৈরী হয়। আজও যেখানে অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রয়োজন সেখানে এই ধরণের বৈদ্যুতিক সেলের ব্যবহার, যেমন টেলিফোন যন্ত্রে। এই ধরণের সেলকে প্রাইমারি সেল বলা হয়। সেকেণ্ডারি সেলে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখা যায় ও তার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করা সম্ভব। এই সেল মোটর গাড়ী, বাস ইত্যাদিতে থাকে। ব্যাটারির বিদ্যুৎ ব্যয়সাপেক্ষ এবং খুব একটা জোরালো



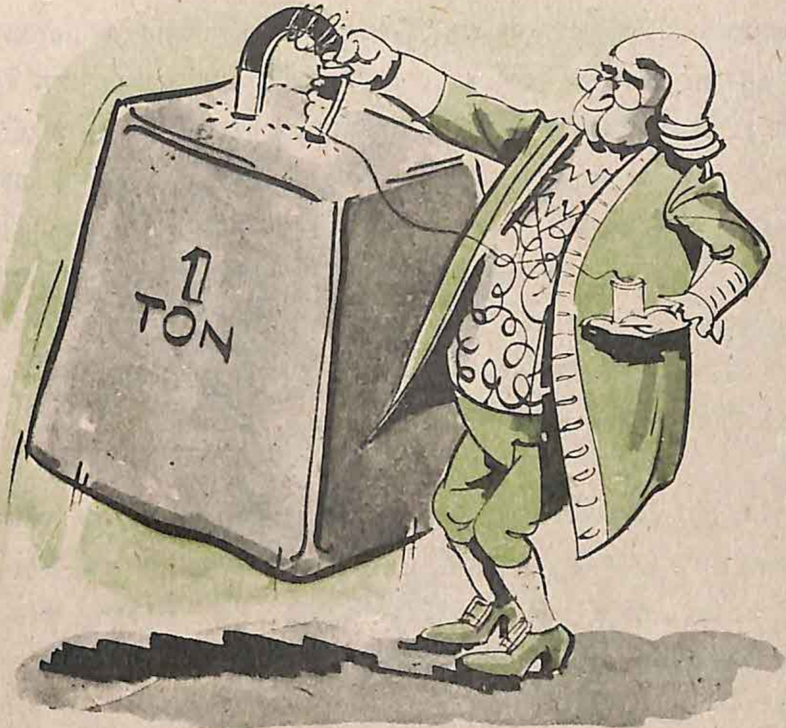
ওরস্টেড আবিষ্কার করেন যে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ভেতর ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে

নয়। তাই সস্তায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতির সন্ধান চলতে থাকে।

এর পর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেন 1820 খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের এক পদার্থ বিজ্ঞানী হ্যান্‌স্ ওরষ্টেড। একদিন তিনি বিদ্যুৎ বিষয়ে ছাত্রদের কিছু পরীক্ষা করে দেখাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় টেবিলের ওপর একটি কম্পাস পড়েছিল। ওরষ্টেড দেখলেন যে কম্পাসটার ওপর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালালে কম্পাসের কাঁটাটা নড়ে উঠছে। বিদ্যুৎপ্রবাহের দিক্ পরিবর্ত্তন করলে কাঁটাটাও সেই দিকে ঘুরে যায়। আর বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করলে কাঁটাটা থেমে যায়।

ওরষ্টেড অবাক হ'য়ে যান। একমাত্র চুম্বকই কম্পাসের কাঁটাকে এভাবে নাড়াতে পারে। তাই বারবার পরীক্ষা করে উনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কোন তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালালে সেটা চুম্বকের কাজ করে। আরও প্রমাণ হ'ল যে বিদ্যুতের সঙ্গে চুম্বকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন এনে দেয়।

এরপর হ'ল বিদ্যুৎ চুম্বকের আবিষ্কার। একটা তারকে লোহার রডের চারপাশে একটু ফাঁক রেখে জড়িয়ে সেই তার দিয়ে বিদ্যুৎ চালালে লোহার রডটা চুম্বক হ'য়ে যায়। নরম লোহা ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করলেই লোহাটি চুম্বকশক্তি হারিয়ে ফেলে। এই চুম্বককে বিদ্যুৎচুম্বক বলা হয়। 1821 খৃষ্টাব্দে যোশেফ হেনরি নামে এক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক এমন একটি বিদ্যুৎচুম্বক তৈরী করেন। এটা শুধু একটি ব্যাটারির বিদ্যুতের সাহায্যে এক টন লোহা তুলে ফেলতে পারতো।



এর পরের আবিষ্কারক হলেন এক গরীব কামারের ছেলে মাইকেল ফ্যারাডে। তিনি ডায়নামো আবিষ্কার করেন, বিরাট এক বৈজ্ঞানিক হিসেবে নাম করেন এবং রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হন। তিনি 13 বছর বয়সে বই বাঁধানোর কাজ শুরু করেন। কিন্তু বইয়ের মলাট বাঁধানোর চেয়ে বইয়ে ভেতরে কি আছে তা জানতে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল। যে কোন বই

এলেই তা তিনি প'ড়ে ফেলতেন। বিজ্ঞান বিষয়ের বই হ'লে তো কথাই নেই।

ফ্যারাডের মনিব খুব সহৃদয় মানুষ ছিলেন। ওঁর পড়াশুনায় কোন ব্যাঘাত ঘটাতেন না। একদিন এক খদ্দের ফ্যারাডেকে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাম্‌ফ্রে ডেভির বিজ্ঞান সংক্রান্ত কয়েকটি বক্তৃতা শুনবার টিকিট দেন। ফ্যারাডে খুব উৎসাহের সঙ্গে বক্তৃতাগুলি শোনেন এবং সেগুলো টুকে রাখেন। কিছুদিন বাদে এই নোটগুলি বাঁধিয়ে তিনি ডেভিকে পাঠান এবং ওঁর ল্যাবরেটারীতে চাকুরী প্রার্থনা করেন। ফ্যারাডে এ-ও জানান যে উনি যে কোন ধরণের কাজ করতে প্রস্তুত। ডেভি ফ্যারাডেকে ডেকে পাঠান এবং এত আগ্রহ দেখে ওঁকে বোতল ধোবার ও ল্যাবরেটারী পরিষ্কার করার কাজ দেন।

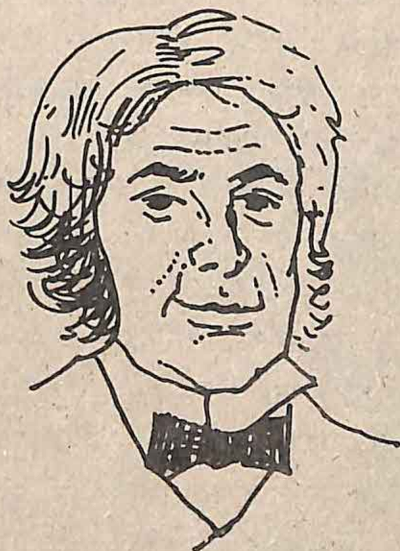
ফ্যারাডে গভীর উৎসাহের সঙ্গে ল্যাবরেটারীর সব গবেষণা দেখতে থাকেন। এ ভাবে কিছু জ্ঞান লাভ করার পর নিজেই গবেষণা শুরু করেন। কাজে দ্রুত এগিয়ে যান এবং বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কালক্রমে তিনি একজন নামজাদা বৈজ্ঞানিক ও রয়াল সোসাইটির সদস্য হন।

স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভিকে তাঁর সব চাইতে বড় আবিষ্কার কি জিজ্ঞাসা করলে উনি ফ্যারাডের নাম বলতেন।

ওরষ্টেড আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ দিয়ে চুম্বক তৈয়ার কথা ফ্যারাডে শুনেছিলেন।

এ থেকে প্রশ্ন জাগে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে যদি চুম্বক সৃষ্টি করা যায় তাহ'লে চুম্বক দিয়ে কেন বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা যাবে না।

এই ধারণা মাথায় রেখে ফ্যারাডে কাজ শুরু করেন। যে মূল বিষয়



মাইকেল ফ্যারাডে

নিয়ে তিনি কাজ করেন তা বোঝা শক্ত নয়। একটি লম্বা তারকে সিলিণ্ডারের আকৃতিতে মোড়া একটি পিচবোর্ডের চারপাশে জড়ানো হ'ল। আর এই তারের দুই প্রান্তে বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপবার যন্ত্র—গ্যালভানোমিটার লাগানো হ'ল। তারপর সিলিণ্ডারটির ভিতরে একটি চুম্বকদণ্ড বসানো হল।

ফ্যারাডে দেখে হতাশ হলেন যে এতে গ্যালভানোমিটারের কাঁটা নড়লো না। কিন্তু বিরক্ত হ'য়ে চুম্বকটি ফেলে দেবার জন্যে টেনে নিতে কাঁটাটা নড়ে উঠলো। ফ্যারাডে বুঝলেন যে চুম্বকটি নাড়ালে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়; চুম্বকটি স্থির রাখলে তা হয় না। চুম্বকের গতি যত দ্রুত করা যায় ততই জোরালো হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ। আরও দেখা গেল যে তারটির পাকের সংখ্যা বাড়ালেও বিদ্যুৎপ্রবাহ জোরালো হয়। এর ওপর ভিত্তি করে ফ্যারাডে প্রথম ডায়নামো তৈরী করেন। তিনি একটি তারের রীলকে অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের দুই প্রান্তের ভেতর ঘোরান। জলপ্রবাহ চালিত কাঠের চাকার সঙ্গে কয়েল জুড়ে এবং তা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করা হ'ল। এই কয়েলটিকে বলা হয় আরমেচার। বাষ্প, জলপ্রবাহ বা গ্যাসের সাহায্যে ডায়নামোর আরমেচার ঘোরানো যায়। যেখানে জলশক্তি সহজলভ্য সেখানে বিদ্যুৎ তৈরীর খরচ সর্বাপেক্ষা কম। নায়েগ্রার বিশাল জলপ্রপাতকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে টারবাইনের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। টাটার জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনাতে বর্ষার জল একটি উঁচু জায়গায় ধরে রেখে পাইপ দিয়ে সেই জলে টারবাইন ঘোরানো হয়। এই দুই ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, জল ক্রমে টারবাইনের পাখায় আঘাত করে তাকে ঘোরায়। এইভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎ অনেক সুলভ। এর ব্যবহারও বহুবিধ।

শক্তির উৎস হিসেবে বাষ্পর চাইতে বিদ্যুৎ অনেক বেশী উপযোগী। প্রয়োজন মত সুইচ টিপে বিদ্যুৎশক্তি কাজে লাগানো ও বন্ধ করা যায়। বিদ্যুতের উৎপাদন পদ্ধতি অনেক দ্রুত ও পরিচ্ছন্ন। কয়লা বা তেল জ্বাললে ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করলে

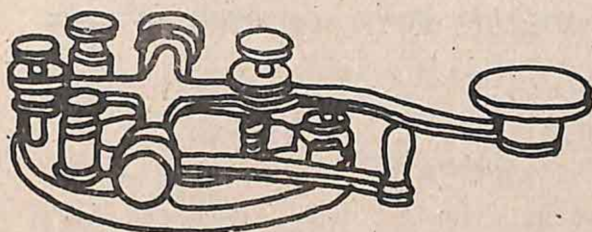
কয়লার ছাইয়ে ভরে যাবার ভয় নেই। তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তি অনেক দূরে পাঠানো চলে। প্রাথমিক খরচ একটু বেশী এটা ঠিক। কিন্তু রোজকার খরচ অনেক কম। তার দিয়ে নির্ঝাটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব।



ডায়নামোর উল্টো হ'ল ইলেকট্রিক মোটর। ডায়নামোতে কয়েলকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয় আর ইলেকট্রিক মোটরে বিদ্যুতে কয়েলকে

ঘোরানো হয়। পাখা, পাম্প, ট্রাম, ইলেকট্রিক ট্রেন ও বিবিধ যন্ত্রে ইলেকট্রিক মোটরের ব্যবহার। ইলেকট্রিক মোটর ডায়নামোর ধাঁচেই তৈরী।

বিদ্যুৎ থেকে ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ নামে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। এই বিজ্ঞান কিরকম সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তা আমরা দেখ্‌বো।

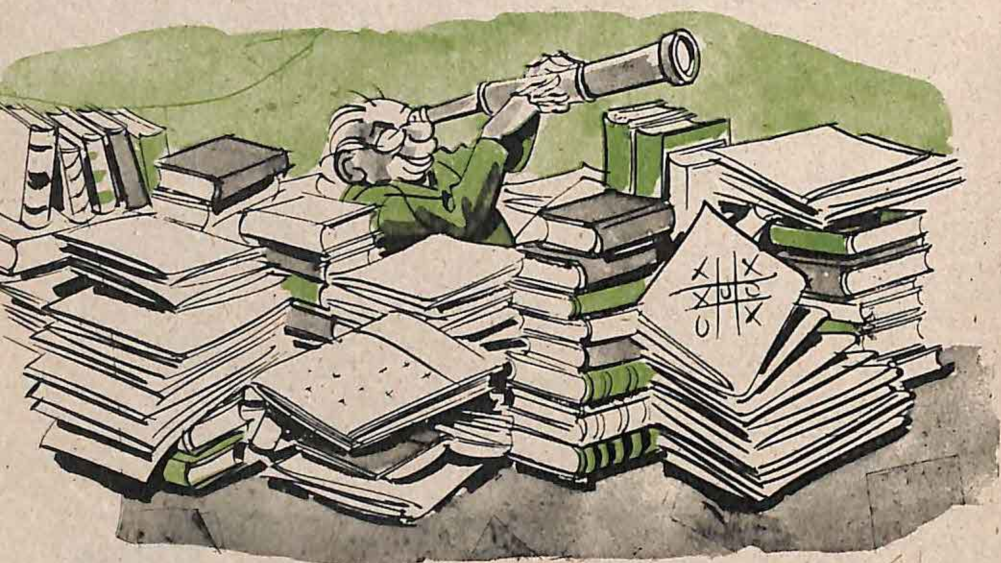


টেলিগ্রাফ

1833 খ্রষ্টাব্দে জন্ হার্শেল নামে এক ইংরেজ জ্যোতির্বিদ দক্ষিণ গোলার্দ্ধের আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে নেন একটি শক্তিশালী দূরবীণ ও অন্যান্য অনেক যন্ত্রপাতি। আকাশের যে অংশ উত্তর গোলার্দ্ধের লোকেরা কখনও দেখতে পায় না সেই অংশের ম্যাপ ও

চার্ট করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। জন হার্শেল তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করতে উত্তমাশা অন্তরীপে তিন-চার বছর থাকার পরিকল্পনা করেন।

রিচার্ড লক নামেনউ তিয়র্ক সান পত্রিকার এক সাংবাদিকের মাথায়



অদ্ভুদ একটা খেয়াল চাপে। তিনি ভাবলেন যে যাচাই করবার কোন উপায় নেই বলে জন হার্শেলের আবিষ্কার বিষয়ে তিনি যা লিখবেন লোকেরা তাই বিশ্বাস করবে। জাহাজের মারফৎ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে

কোন খবর আনাতে কয়েক মাস সময় লাগতো। ইতিমধ্যে লক ভাবলেন, মজা-তামাশা করলে মন্দ হয় না।

প্রথম প্রবন্ধে তিনি লিখলেন যে হার্শেল এক নতুন ধরণের দূরবীণ আবিষ্কার করেছেন। এই দূরবীণের খুঁটিনাটি এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল যে বৈজ্ঞানিকরা তা বিশ্বাস করলেন। তারপরেই তামাশা শুরু। লক লিখলেন যে এই দূরবীণ দিয়ে হার্শেল দেখেছেন যে চাঁদের পাহাড়-পর্বত দামী পাথর দিয়ে তৈরী। কয়েক ধরণের প্রাণীর অস্তিত্বের কথাও প্রকাশ করলেন আর লিখলেন যে চাঁদের সমুদ্রতীরে বালির ওপর বিরাট গোলাকৃতি দানবেরা তীব্রবেগে গড়িয়ে বেড়ায়।

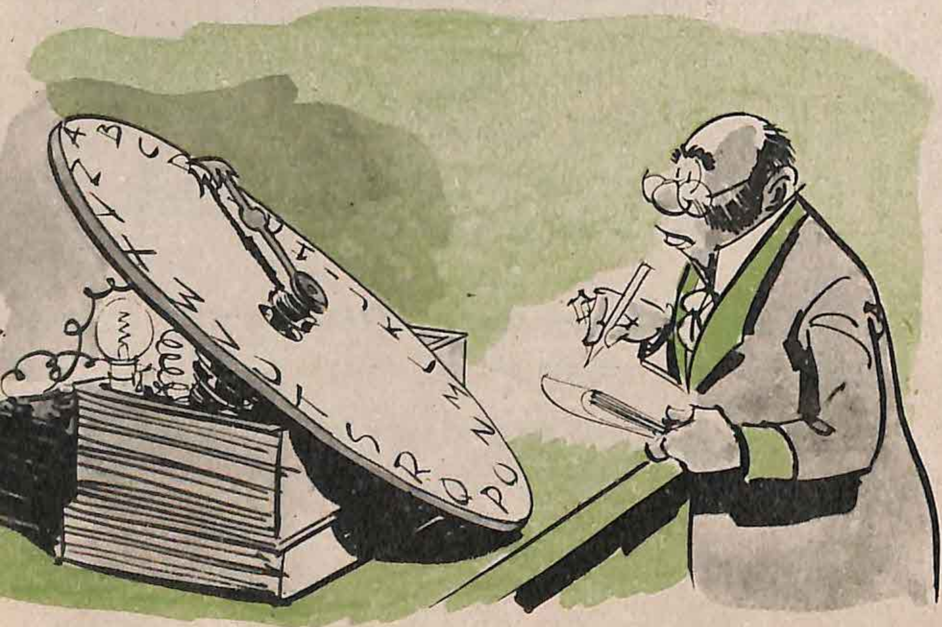
পাঠকেরা লকের এই সব উদ্ভট গল্প বিশ্বাস করে চমৎকৃত হলেন। লকের বর্ণনা নৈপুণ্যে বৈজ্ঞানিকরাও প্রতারিত হলেন।

কয়েক মাস পরে জানা গেল সবটাই ধোঁকাবাজী। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমনি আর হয়নি।

আজকের দিনে কেউ এ ধরণের চাতুরী করার কথা কল্পনাও করতে পারে না। টেলিগ্রাফের কল্যাণে আমরা মহাসমুদ্র পেরিয়ে এক মহাদেশের খবর অন্য মহাদেশে কয়েক মিনিটেই পেয়ে যাই।

বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চুম্বক বিষয়ে ওরষ্টেডের আবিষ্কারের পর থেকেই লোকেরা বিদ্যুৎকে অন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করছিল।

1809 খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার একজন বৈজ্ঞানিক বর্ণমালার প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্যে একটি করে তার নিয়ে জলভর্তি পাত্রে সাজালেন। তারপর প্রতিটি তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালানোতে নীচের দিকে বুদ্বুদের সৃষ্টি হ'তে লাগলো। এই আবিষ্কার যথেষ্ট সাড়া জাগালেও এর বাস্তব কার্যকারিতা কিছু প্রমাণ করা গেল না।



1825 খৃষ্টাব্দ নাগাদ ব্যারণ শিলিং চুম্বকের টেলিগ্রাফ তৈরী করেন। একটি কার্ডে সাদা ও কালো চিহ্ন দেওয়া হ'ল। তারপর বিদ্যুতের সাহায্যে সেই কার্ডে সাদা ও কালো চিহ্নের ওপর যথাক্রমে একটি চুম্বকের কাঁটা সঞ্চালন করা হ'ল। কাঁটাটি কালো ও সাদা চিহ্ন ছুঁয়ে "সাদা-কালো", "কালো-কালো-সাদা" ইত্যাদি সংকেতের সাহায্যে এক একটি অক্ষর নির্দেশ করতে পারতো।

1837 খৃষ্টাব্দে চার্লস্ হুইটষ্টোন এই যন্ত্রের সামান্য পরিবর্তন করেন। তিনি একটা ডায়ালের প্রান্তে অক্ষর এবং সংখ্যা লিখে কাঁটাটিকে ঘোরানোর ব্যবস্থা করেন। কাঁটাটির অবস্থান থেকে সাঙ্কেতিক খবর পড়া যেত। ধীরগতির হ'লেও রেলে এই যন্ত্রের ব্যবহার বহুদিন থেকেই চালু এবং হুইটষ্টোন এর থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন।

তারপর এলেন আধুনিক টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা স্যামুয়েল এফ্. বি. মর্স। মর্স অপ্রত্যাশিতভাবে টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। জন্ম মার্কিন দেশে। স্কুলে বিজ্ঞান পড়লেও নাম করলেন শিল্পী হিসেবে। পোর্ট্রেট আঁকিয়ে হিসেবেও খুব নামডাক। বিশ্বের প্রসিদ্ধ চিত্রকলা দেখবার জন্যে ইউরোপ ঘুরে বেড়ালেন। ইউরোপ থেকে ফেরার পথে জাহাজে তিনি প্রথম টেলিগ্রাফের বিষয়ে শোনেন। সহযাত্রী ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। বিদ্যুৎ বিষয়ে গবেষণার সব কথা বলে তিনি মর্সকে একটি ছোট বিদ্যুৎচুম্বক দেখান।

মর্স তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। যদি বিদ্যুৎপ্রবাহ দূরে পাঠানো যায়

তবে তার মাধ্যমে খবর পাঠানো-ই বা কেন সম্ভব হবে না? ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে এই চিন্তা ওঁর মাথায় ঘুরতে থাকে। তখন ওঁর আগ্রহ দেখে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ গেল্ ওঁকে কলেজের ল্যাবরেটারিতে গবেষণা চালাতে উৎসাহ দেন

বৈজ্ঞানিক যোশেফ হেন্‌রী এ বিষয়ে আগে অনেক কাজ করেছিলেন। তাঁকেও গেল্ জানতেন। যোশেফ হেন্‌রী এমন মানুষ যে কেউ কোন বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে এলে তিনি সবসময় সাহায্য করতে প্রস্তুত। তিনি মর্সকে সাহায্য করেন এবং 1832 সালে পাতা ওঁর 5 কিলোমিটার লম্বা টেলিগ্রাফ লাইনটি মর্সকে দেখান। এই লাইনেতে বিদ্যুৎ চুম্বকের সাহায্যে ঘণ্টা বাজিয়ে সঙ্কেতের আদান প্রদান চলতো।

মর্স এ সঙ্কেত যন্ত্র ব্যবহার করতে রাজী হলেন বটে কিন্তু তাঁকে যে আরও দুটো সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ যন্ত্রটি দিয়ে 5 কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত কাজ চালান যায়। কিন্তু মর্স চান শতাধিক কিলোমিটার দূরত্বের ওপর কাজ করতে। তাছাড়া হেন্‌রীর সাঙ্কেতিক চিহ্ন তাঁর অতটা পছন্দ হয়নি। তাঁর চাই একটি উন্নততর সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

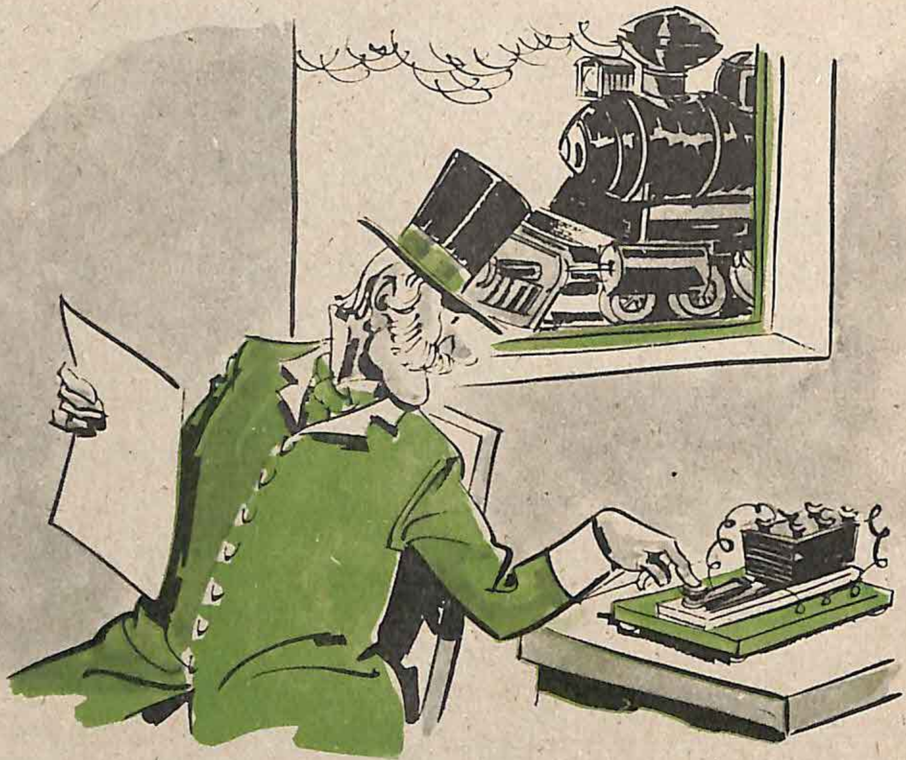
প্রথম সমস্যা সমাধানে যোশেফ হেন্‌রী নিজেই সাহায্য করলেন। লাইনের বিভিন্ন জায়গায় 'রীলে' নামে একটা যন্ত্র বসানো হ'ল। 'রীলে' হ'ল একটি ব্যাটারিযুক্ত কয়েল যার সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহকে নিয়মিত দূরত্বের ব্যবধানে জোরালো করা সম্ভব।

মর্স কোড

এ · —	জে · — — —	আর · — ·
বি — · · ·	কে — · —	এস · · ·
সি — · — ·	এল · — · ·	টি —
ডি — · ·	এম — —	ইউ · · —
ই ·	এন — ·	ভি · · · —
এফ্ · · — ·	ও — — —	ডাবলিউ · — —
জি — — ·	পি · — — ·	এক্স্ — · · —
এইচ · · · ·	কিউ — — · —	ওয়াই — · — —
আই · ·		জেড্ — — · ·

এবার পরবর্তী সমস্যা। মর্স ওর বিখ্যাত "মর্স কোড"-এর আবিষ্কার করেন। সবরকমের সঙ্কেত বার্তায় বিশেষত সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীতে আজও এর প্রচলন। এই পদ্ধতিতে দুটি শব্দ 'টরে' ও 'টক্কা' সমন্বয়ে সমস্ত বর্ণমালার সঙ্কেত করা সম্ভব।

1837 সালে মর্স ওঁর আবিষ্কারের পেটেন্ট নেন ও গভর্ণমেণ্টকে এই পদ্ধতির ব্যবহার করতে অনুরোধ করেন। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে মর্স দারিদ্র্য ও অবহেলায় জীবন অতিবাহিত করেন। অবশেষে সরকার ওঁর



আবিষ্কার প্রদর্শনের জন্যে 30 হাজার ডলার মঞ্জুর করেন। মর্স ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত 65 মাইল দূরত্বের দীর্ঘ একটি তার বসান। এই তারে খুঁটির ওপর দিয়ে 100 সেলের ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। 1844 সনের 24শে মে এই তারে প্রথম বার্তা পাঠানো হয়। বার্তাটি হ'ল—'ঈশ্বর কি কর্ম সাধন করিলেন?' সত্যি ভগবান এক আশ্চর্য জিনিষ তৈরী করালেন যা পৃথিবীতে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিল।

পরীক্ষা সফল হ'লেও মার্কিন সরকার টেলিগ্রাফের বিষয় সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করাতে বেসরকারী ব্যবসায়ীরা আগে এগিয়ে আসেন এবং শীগিগ্রই টেলিগ্রাফের তারের গুঞ্জনে দেশ মুখরিত হ'য়ে ওঠে।

বৈজ্ঞানিক এবং আবিষ্কারকরা এবার ভাবতে লাগলেন যে একই তারে একাধিক বার্তা পাঠানো সম্ভব হলে অনেক বেশী পয়সা রোজগার করা যাবে। আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল নামে এক যুবক এই কাজে এগিয়ে আসেন। আরও একটি বড় জিনিস তিনি আবিষ্কার করেন। তা হ'ল টেলি-ফোন। বেল বধিরদের শিক্ষক ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি মানুষের কানের গঠন ও তার শব্দগ্রহণ ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক পড়াশুনা করেছিলেন। ওঁর বাসনা ছিল এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করবেন যার সাহায্যে বধিররা পড়তে পারে।

যে কোন শব্দ হাওয়াতে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে, অনেকটা পুকুরে ঢিল ছোঁড়ার মত। যখন এই তরঙ্গ কানের পর্দা ও তার পিছনের ছোট একটি হাড়কে কাঁপিয়ে তোলে তখন আমরা সেই শব্দ শুনতে পাই। ঠিক সেইভাবে যখন টেলিফোনের এক দিকে কথা বলা হয় তখন একটি পাতলা চাক্তিতে (diaphragm) কম্পনের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এক কথায় কম্পন সৃষ্টি করার জন্যে এই চাক্তি।



আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল

একদিন বেল ওঁর সহকর্মী ওয়াটসনের সঙ্গে ল্যাবরেটারিতে এক টুকরো ধাতুর পাতে কম্পন সৃষ্টির পরীক্ষা করছিলেন। পাতটা আটকে গিয়েছিল। ওয়াটসন সেটা টেনে তুলবার সময় তার শব্দ পাশের ঘরে তারের মাধ্যমে বেলের কাছে পোঁছোয়। বেল ছুটে এসে এই শব্দের কারণ দেখে উল্লসিত



হ'ন। তিনি বুঝতে পারলেন যে ঈশ্বর আর একটা বিস্ময়কর জিনিষ সৃষ্টি করতে চলেছেন!

আরও এক বছর কঠোর পরিশ্রম করে বেল ওঁর আবিষ্কার নিখুঁত করে

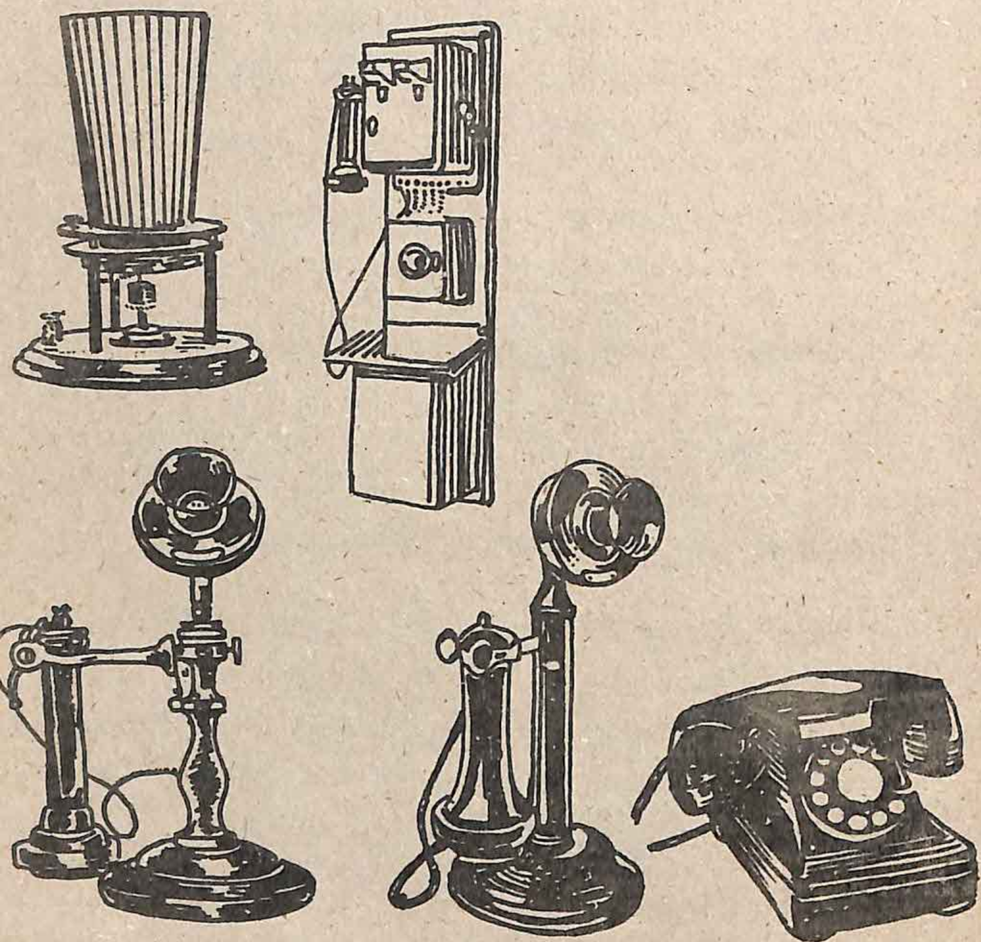
তোলেন। শিঙের আকৃতির এই কথা বলবার যন্ত্রের নলের ভেতর একটি পাতলা চাক্‌তি বসানো হলো। কথার শব্দ তরঙ্গে চাকতিটি কাঁপে। এই কম্পন বিদ্যুৎচুম্বকের কয়েলের মাধ্যমে বিদ্যুৎপ্রবাহে তারতম্য ঘটায়। বিদ্যুৎপ্রবাহের তারতম্য তারের ভেতর দিয়ে অপর প্রান্তে শব্দগ্রাহী যন্ত্রের চাকতিতে একই তরঙ্গ তোলে।

1876 খৃষ্টাব্দে বেলের আবিষ্কার ফিলাডেলফিয়া প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাবার পর এই যন্ত্রের আরও উন্নতি ও বহুল প্রচলন হয়।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের মাধ্যমে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যোগাযোগ স্থাপনার কাজ চলতে লাগল। কিন্তু সমুদ্র পার করা যায় কি করে, তা তখনও জানা বাকি। এপার থেকে ওপার অবধি তার নিয়ে যাবার একটা উপায় বার করতে হবে। বহু চেষ্টা বিফল হলো। বহু লোকের বহু অর্থ জলে গেল। কিন্তু অনেকে আবার সফলও হলেন।

কাজটা সহজ ছিল না। সমুদ্রের নীচে বেশ কয়েক কিলোমিটার গভীরে তার পাতবার দরকার। জলের নীচে তার বসাবার কাজ সম্ভবত ভারতেই প্রথম হয়। 1839 খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টার ও'শৌগনেসী প্রথমে হুগলী নদীর এপার থেকে ওপার অবধি তার পাতেন। তিনি সীসার পাইপের ভেতর রবারে মোড়া তারের ব্যবহার করেন।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সংযোগের প্রথম চেষ্টা করেন জন ওয়াটকিন্‌স্ ব্রেট। তাঁর ভাই ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। তিনিও তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন। ওঁদের চুক্তির শেষ দিন ছিল 1850 সালের 1 সেপ্টেম্বর। তার তৈরী করবার পর



টেলিফোনের ক্রমবিকাশ প্রথম যুগ হইতে বর্তমান যুগ

সেটা পাতবার জন্যে এঁদের হাতে সময় ছিল মাত্র 3 দিন। এঁরা কোনক্রমে এই সময়ের মধ্যে একটি বার্তা পাঠিয়ে চুক্তি পূর্ণ করলেন।

কিন্তু পরের দিন সকালে দেখা গেল তারটা একেবারে মরা। কারণ একটি মাছ ধরার নৌকোর নোঙরে আটকে যাওয়াতে জেলেরা তাদের বন্ধুদের দেখাবে বলে সেই তারের কিছুটা কেটে নিয়ে যায়। তাই সেই লাইন বিকল হ'য়ে যায়।

আটলান্টিক সমুদ্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তার টানা এক উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। ইংরেজ ও মার্কিনরা এই কাজ দুই দেশের নৌবাহিনীর সাহায্যে করেন। অনেক বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এই কাজ 1866 খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডের ভ্যালেনৃশিয়া থেকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হয়ে কানাডা অবধি তার পাতা হ'ল। এইভাবে ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে আটলান্টিক পেরিয়ে হাত মেলালো।

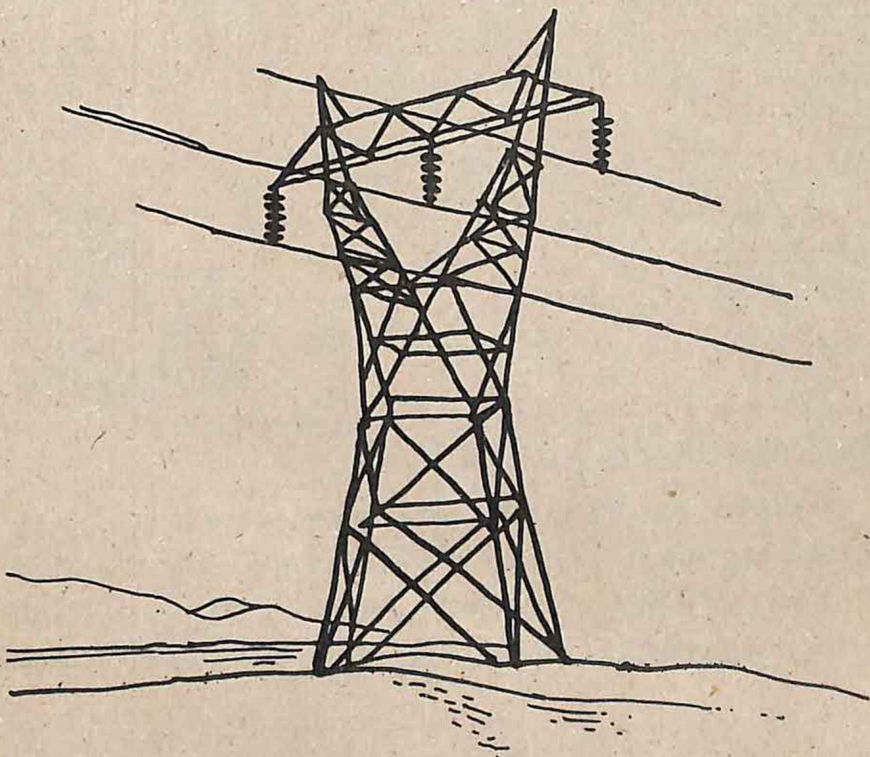
1866 এর পর সমুদ্রগর্ভে আরও অনেক তার পাতা হয়। 1870 খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের সংযোগ হয়। আগে ইংলণ্ড থেকে বোম্বাইতে একটি তারবার্তা পৌঁছতে এক সপ্তাহ সময় লাগতো। তাছাড়া অনেকগুলি অন্তর্বর্তী ষ্টেশনের মাধ্যমে পুর্নপ্রেরণের ফলে খবরে অনেক ভুল থেকে যেতো। মূল খবরটা উদ্ধার করা বেশ শক্ত হতো। সমুদ্রগর্ভে সরাসরি তার পাতাতে কয়েক মিনিটের ভেতর এক দেশ থেকে আরেক দেশে খবর পাঠানো সম্ভব হ'ল।

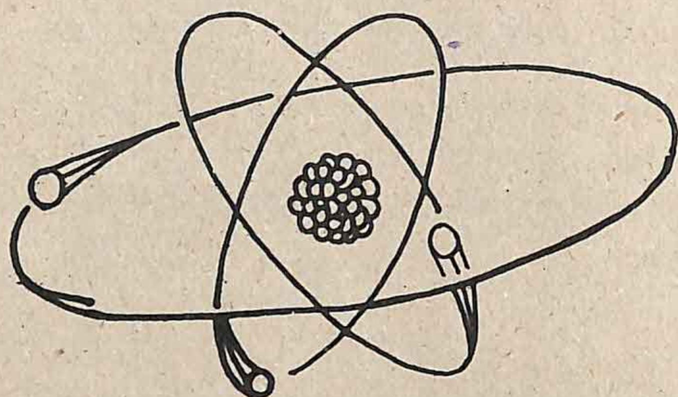
ক্রমে আরও নতুন নতুন আবিষ্কার। আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে টেলিফোনের মাধ্যমে হাজার কিলোমিটার দূরের মানুষের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা হ'ল। এর পর এলো রেডিও ও টেলিভিশন।



এখন মানুষ পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে সেই খবর কাগজে পড়ে জানে। দূর-দূরান্তের তাজা খবর সংগ্রহ করে রাতারাতি তা ছাপাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা আজ এক দূর-সংযোগের নতুন যুগে পদার্পণ করেছি। শীগিগ্রই আমরা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবী জুড়ে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ও টেলিভিশনের প্রচলন দেখবো। আজকের এই দ্রুত সংযোগ ব্যবস্থা মানুষের এক প্রধান কীর্ত্তি।

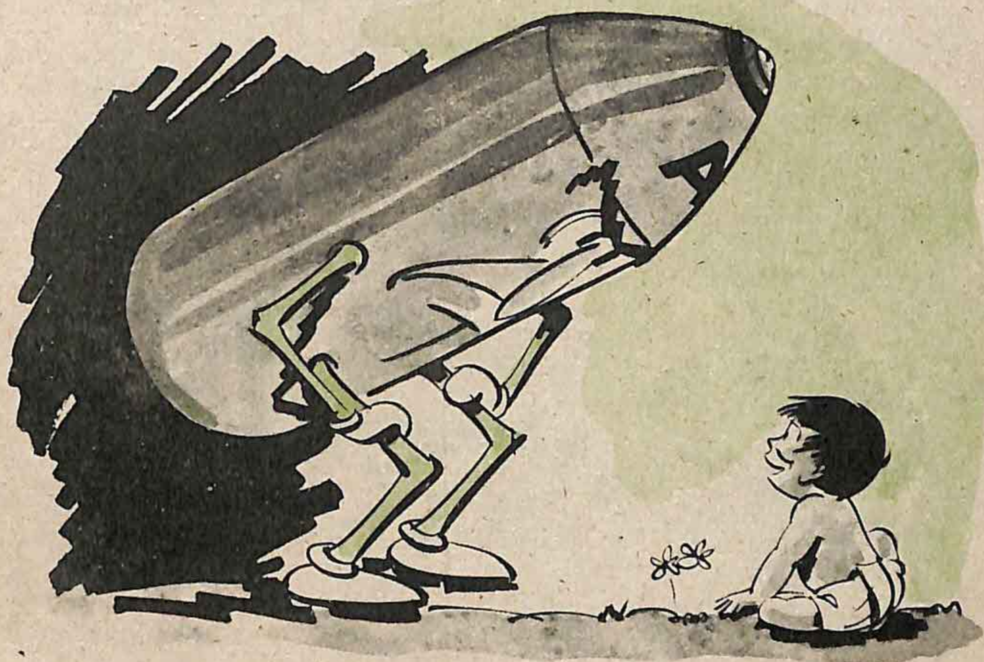




পারমাণবিক শক্তি

আণবিক বা পারমাণবিক শক্তি বলতে আমরা অনেকেই শুধু ধ্বংসাত্মক শক্তিই বুঝে থাকি। এর কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেই প্রথম পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে এনরিকো ফার্মির নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক দল 1942 সালের 2রা ডিসেম্বর প্রথম পারমাণবিক

ক্রমিক প্রতিক্রিয়া (nuclear chain reaction) সৃষ্টিতে সক্ষম হলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা যে, যে-শক্তির উৎসকে



মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করা যেত তাকে অবর্ণনীয় ধ্বংসের কাজেই প্রথম লাগানো হ'ল।

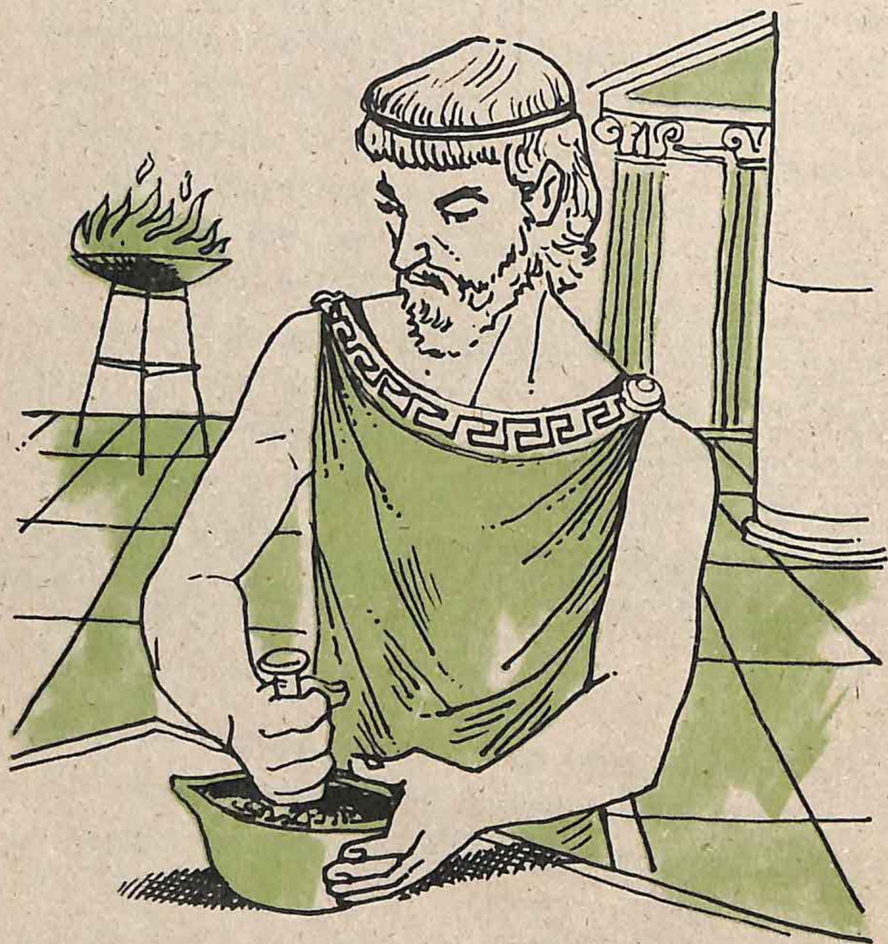
1945 সালের 6ই আগষ্ট জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর প্রথম আণবিক বোমা ফেলা হয়। তার তিন দিন বাদে আরেকটি আণবিক বোমা শিল্প প্রধান শহর নাগাসিকিতে। জমি থেকে 600 মিটার ওপরে তুটো বোমারই বিস্ফোরণ ঘটে। সেই ধ্বংসের চেহারা ছিল বিভৎস ও ভয়ানক।



ধূলিসাৎ হয়ে যায় তুটি সুন্দর শহর। বাড়ীঘর চুরমার হয়ে যায়। স্ত্রী পুরুষ শিশু অগণিত মানুষ মরে যায়; বাঁচল যারা তারাও পঙ্গু ও অথর্ব হয়ে রইল। অনুমান করা হয় যে এই তুটি বিস্ফোরণের ফলে লক্ষাধিক লোক মারা যায় আর 75 হাজার মতো লোক নিখোঁজ ও আহত।

আণবিক শক্তি কি তা বুঝতে হ'লে আমাদের প্রথমে পদার্থ, মৌলিক পদার্থ, অণু ও পরমাণু সম্বন্ধে জানা দরকার। পদার্থ হ'ল এমন জিনিষ যা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় ও যার ওজন আছে। তবে সমস্ত পদার্থেই এমন কতকগুলি বস্তু আছে যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। এই মৌলিক বস্তুগুলিকে বলা হয় মৌলিক পদার্থ। প্রাকৃতিক অবস্থায় মৌলিক পদার্থের মোট সংখ্যা হল 92। বৈজ্ঞানিকরা আরও এক ডজন মতো মৌলিক পদার্থ ল্যাবরেটারিতে সৃষ্টি করেছেন। এদের ভেতর সব চাইতে হাল্কা হ'ল হাইড্রোজেন আর সব চাইতে ভারী ইউরেনিয়াম। অধিকাংশ মৌলিক পদার্থই কঠিন, যেমন, লোহা, রূপা, তামা, সীসা ইত্যাদি। পারার ও ব্রোমাইনের মতো কয়েকটি মৌলিক পদার্থ তরল অবস্থায় থাকে। আর অক্সিজেন ও ক্লোরাইনআদি কিছু পদার্থ বায়বীয়। যখন একাধিক মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রনে একটি নতুন বস্তুর সৃষ্টি হয় তাকে বলে যৌগিক পদার্থ। যেমন, পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ নিয়ে যে জলরাশি, তা অক্সিজেন ও হাই-ড্রোজেনের যৌগিক মিশ্রণ। যে কোন যৌগিক পদার্থে মৌলিক পদার্থগুলি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে। প্রত্যেক যৌগিক পদার্থের নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। আমরা জানি জলে আগুণ নেভানো যায়। কিন্তু আলাদাভাবে হাইড্রোজেন একটি দাহ্য বস্তু ও অক্সিজেন সক্রিয় ভাবে জ্বলনে সাহায্য করে।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। যদি একটা চককে ভেঙে আমরা ছোট ছোট টুকরো করি প্রতিটি টুকরোতেই চকের সমস্ত গুণাবলী পাওয়া যাবে। চকটাকে এভাবে যদি আমরা ভাঙ্গতে থাকি তবে এমন একটা অবস্থা আসবে



যখন চকটাকে আর ভাঙ্গা সম্ভব নয়। এইভাবে যে ক্ষুদ্রতম বস্তুটি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় চকের পরমাণু মলিক্যুল।

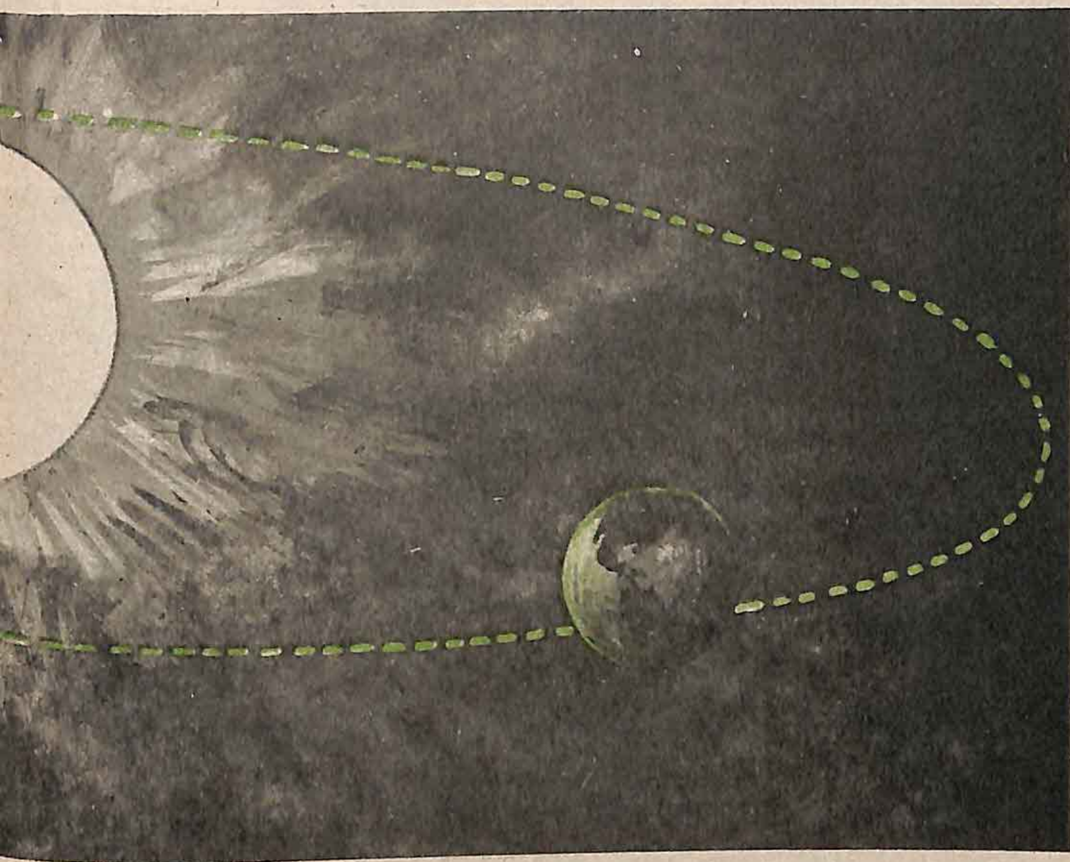
চকের পরমাণু তিনটি বস্তু দিয়ে তৈরী—ক্যালসিয়াম, কার্বন ও অক্সিজেন। পরমাণুটিকে এই তিন মৌলিক পদার্থে ভাগ করলে এটা আর চক থাকবে না।

একটি জলের পরমাণুতে দুই অণু হাইড্রোজেন এক অণু অক্সিজেন থাকে। মনে মনে যদি একটা ছবি আঁক তবে পরমাণুর সূক্ষ্ম আকার সম্বন্ধে তোমরা একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারবে। এই যেমন পরমাণুর আয়তন এত ছোট যে এক ফোঁটা বৃষ্টির জলে পরমাণুর সংখ্যা আর ভূমধ্যসাগরে জলের ফোঁটার সংখ্যা প্রায় সমান। ধর লোহার মত কোন পদার্থ নিয়ে যদি আমরা ক্রমাগত ভাঙতে থাকি তবে আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছাবো যখন আর ভাঙা সম্ভব নয়। তখন আমরা লোহার অণু পাবো কারণ সেটা আর ভাঙ্গা যায় না।

সেকালে বহু গ্রীক দার্শনিক ভাবতেন যে, যে কোন পদার্থকে পিষে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করা চলে। কিন্তু অন্যদের ধারণা ছিল যে একটি ক্ষুদ্রতম আয়তনের পর কোন বস্তুকে আর ভাঙা চলে না। এঁরাই প্রথমে অণু সম্পর্কে সচেতন হন।

একটি অণুতে অনেকটা শূন্যস্থান আছে। অণুর তিনটি অংশ আছে—প্রোটন, ইলেক্‌ট্রন ও নিউট্রন। অণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসে অণুর ওজনের অধিকাংশটাই কেন্দ্রীভূত। অণুর কেন্দ্রের চারপাশে খুব ছোট হাল্কা

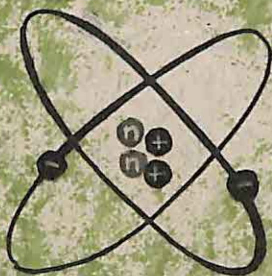


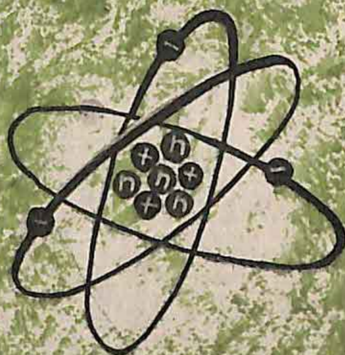


কেন্দ্রকের চতুষ্পার্শে ইলেকট্রন সূর্যের চারিদিকে গ্রহের মত ঘুরতে থাকে

ইলেক্‌ট্রনগুলি অনেকটা সূর্য্যের চারপাশে গ্রহের মত ঘুরতে থাকে। ইলেক্‌ট্রনে অল্প নেগেটিভ বিদ্যুৎ থাকে।

অণুর কেন্দ্রস্থলে প্রোটন ও নিউট্রন সংযুক্ত হ'য়ে আছে। প্রোটনে





লিথিয়াম কেন্দ্রক

হিলিয়াম কেন্দ্রক

পজিটিভ বিদ্যুৎ ও ইলেকট্রনে নেগেটিভ বিদ্যুৎ সমপরিমাণে আছে। যে কোন অণুতে ইলেক্টন ও প্রোটনের সংখ্যা এক হওয়াতে সব মিলিয়ে একটি অণু বৈদ্যুতিক দিক থেকে নেগেটিভ।

নিউট্রনে কোন বিদ্যুৎ নেই। এর আয়তন এবং ওজন প্রোটনের সমান।

যে কোন বস্তুর অণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা দিয়ে তার মৌলিকত্ব



A ডেন্টেরিয়াম অণু B ট্রিটিয়াম অণু C হাইড্রোজেন অণু

নির্দ্ধারিত হয়। বস্তুর জড়পিণ্ড নিউট্রনের সমষ্টি মাত্র। হাইড্রোজেন অণুতে একটি মাত্র প্রোটন আছে। হেলিয়াম অণুতে আছে দুটি প্রোটন ও লিথিয়াম অণুতে তিনটি প্রোটন।

অনেক সময় একই মৌলিক পদার্থের অণুতে বিভিন্ন সংখ্যার নিউট্রন থাকে এবং তাতে জড়পিণ্ডের তারতম্য হয়। এই ধরণের একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন আকৃতিকে বলা হয় আইসোটোপ (isotope)। আইসোটোপের আকৃতিগত বিভেদ থাকলেও এদের গুণাবলী এক। উদাহরণস্বরূপ, হাইড্রোজেনের অণুতে শুধু একটি প্রোটন আছে কিন্তু কোন নিউট্রন নেই। আবার ডিউটেরিয়াম নামে আরেক ধরণের দুষ্প্রাপ্য হাইড্রোজেন অণুতে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন থাকে। কৃত্রিম উপায়ে একটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রন দিয়ে ট্রিটিয়াম নামে একটি তৃতীয় ধরণের অণু তৈরী করা হয়।

বৈজ্ঞানিকরা একটি অণুকে আরও বিভক্ত করার চেষ্টা করেন। কিছু ইলেকট্রন বিশেষ করে নিউক্লিয়াস থেকে যেগুলো দূরে অবস্থিত সেগুলোকে বিভক্ত করা সম্ভব। যদি কোন কাঁচ দণ্ডকে সিল্ক দিয়ে ঘষা যায় তাহলে কাঁচের গা থেকে কিছু ইলেকট্রন সিল্কে উঠে আসে। এতে সিল্কে নেগেটিভ বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। আর ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যাওয়াতে কাঁচদণ্ডটিতে পজিটিভ বিদ্যুৎ তৈরী হয়।

কিন্তু অণুর কেন্দ্রকে বিভক্ত করতে বৈজ্ঞানিকদের হিমসিম খেতে হয়। প্রোটন ও নিউট্রন এত ঘন সংস্পৃষ্ট যে তাদের আলাদা করা সহজ নয়।
ইতিমধ্যে মেরী ও পিয়ের কুরী রেডিয়াম নামে নতুন একটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। এই জাতীয় আরও কিছু তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়। তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ থেকে কিছু তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এবং এরা নিজে থেকেই বিভিন্ন হতে থাকে। এগুলি এত ভারী যে এরা

নিজেরাই একটি বিশেষ হারে বিভক্ত হতে থাকে। এদের ভেতর ইউরেনিয়াম হ'ল সব চাইতে ভারী।

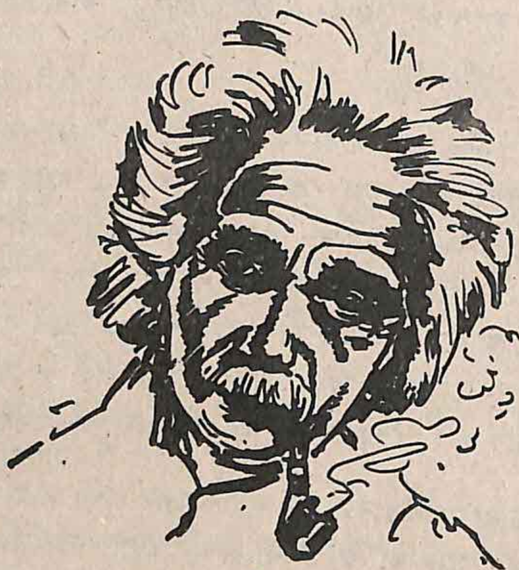
রেডিয়ামকে বিভক্ত করলে তার থেকে দুই ধরণের কণা ও এক জাতীয় রশ্মি পাওয়া যায়। এই কণাগুলিকে আল্ফা ও বীটা বলা হয়। বীটা কণাতে ইলেকট্রন থাকে আর আলফা কণাতে হিলিয়ামের কেন্দ্রক থাকে অর্থাৎ এতে থাকে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন। আর এর শক্তিশালী রশ্মিকে বলা হয় গামা রশ্মি।

রেডিয়াম থেকে নির্গত কণার গতিবেগ অতি দ্রুত। বৈজ্ঞানিকরা ভাবলেন এদের দিয়ে বুলেটের মত অণুর কেন্দ্রে আঘাত হানা সম্ভব হবে। বীটা কণা খুব হাল্কা বলে কাজে লাগে না কিন্তু আল্ফা কণা ভারী তবে এতে পজিটিভ বিদ্যুৎ থাকে আর অণুর কেন্দ্রেও পজিটিভ বিদ্যুৎ আছে। আর বিদ্যুতের নিয়ম হ'ল এক জাতীয় বিদ্যুৎ পরস্পরকে প্রতিহত করে। কিন্তু আশা করা গেল যে রেডিয়াম নির্গত আল্ফা কণা ভারী ও বেগশালী বলে সহজে প্রতিহত হবে না। বৈজ্ঞানিকরা এই পরীক্ষায় কিছুটা সফলও হলেন।

ইতিমধ্যে চ্যাড্উইক্ নিউট্রনের আবিষ্কার করলেন। এর আগে বৈজ্ঞানিকরা নিউট্রনের অস্তিত্ব আছে তা জানতেন না। বিদ্যুতের চার্জ না থাকাতে বুলেট হিসাবে এটা ব্যবহারের উপযুক্ত হ'ল এবং অণুর কেন্দ্রে এটা প্রতিহত হ'ল না। ইতালিয় বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফার্মি নিউট্রন দিয়ে মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রকে আঘাত করার চেষ্টা করলেন। এই কাজে সাফল্যলাভ করার আগেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তিনি আমেরিকায় পালাতে বাধ্য হন।

কিছু জার্মান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস প্রায় সমান দুই অংশে ভেঙে পড়ে এবং তাতে প্রচণ্ড তেজের সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক অবস্থায় ইউরেনিয়ামকে U-238 এবং U-235 ; এই দুই প্রকার



আলবার্ট আইনষ্টাইন

আইসোটোপে পাওয়া যায়। দুটো থাকে পরস্পরের সঙ্গে জাপটে এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় আমরা যে ইউরেনিয়াম পাই তাতে শতকরা একভাগেরও কম থাকে U-235 আইসোটোপ। ধীর গতির নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে U-235

আইসোটোপ ভেঙে পড়ে। তখন প্রচণ্ড তেজ ও কিছু নিউট্রন বেরিয়ে আসে। যে কটা নিউট্রন এইভাবে বেরিয়ে আসে সেগুলো আবার U-235 নিউ-ক্লিয়াসদের আঘাত করে ভেঙে দেয় এবং এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'তে থাকে। এই চেইন রিয়াকশন থেকে আনবিক বোমার সৃষ্টি।

U-238 আঘাতকারী নিউট্রনকে প্রতিহত করে না। তাই এর কোন রিয়াকশন সম্ভব নয়।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন সেই সময় আমেরিকায় ছিলেন। এই আবিষ্কারের কথা শুনে তিনি মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে জানালেন যে এর থেকে এক মারাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী হতে পারে। প্রেসিডেণ্ট এই বিষয়ে কাজ চালাতে নির্দেশ দিলেন।

পারমাণবিক বোমা তৈরী করার ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকরা এখন দুটি সমস্যার সম্মুখীন হলেন। প্রথমটি হ'ল, নিশ্চিতভাবে চেন রিয়াকশন ঘটানো আর দ্বিতীয়টি, প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে U-235কে আলাদা করা।

এটম বোমার কাজ 1940 সালে শুরু হয়। চেন রিয়াকশনের বিষয়ের গবেষনায় এনরিকো ফার্মি নেতৃত্ব দেন এবং 1942 সালের 2রা ডিসেম্বর এই কাজ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সব সময় যা হয়, এবারও তাই হ'ল। আবিষ্কার থেমে থাকল না। এটম বোমার পর আরও সহস্রগুণ শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা তৈরী হ'ল। এতে হাল্কা এটমের কেন্দ্রকদের সংযুক্ত করে ভারী এটম তৈরী করে তাকে ভাঙা হয়। আরও মারাত্মক অস্ত্র হ'ল কোবাল্ট বোমা। অণুর

কেন্দ্রকের তেজের বিকীরণশীল এই সব বোমাগুলিকে পারমাণবিক বোমা বলা হয়।

পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধের ধারার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের যুগ আর নেই। একটি পারমাণবিক বোমাই একটি শহরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। বোতাম টিপে দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে আণবিক বোমা বহুদূরের নিশানাতে ফেলা সম্ভব। আর কোন যুদ্ধে দুই পক্ষই আণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে তা ভাবা যায় না। আণবিক বোমার লড়াইতে সমস্ত মানবজাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে পারে।

তবে আণবিক বোমার আবিষ্কার যেমন এক দিকে মানুষের হাতে ধ্বংসের ক্ষমতা এনে দিয়েছে তেমনি অন্য দিকে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক শক্তির উৎস কয়লা ও তেল ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসতে পারে যখন এগুলো ফুরিয়ে যাবে।







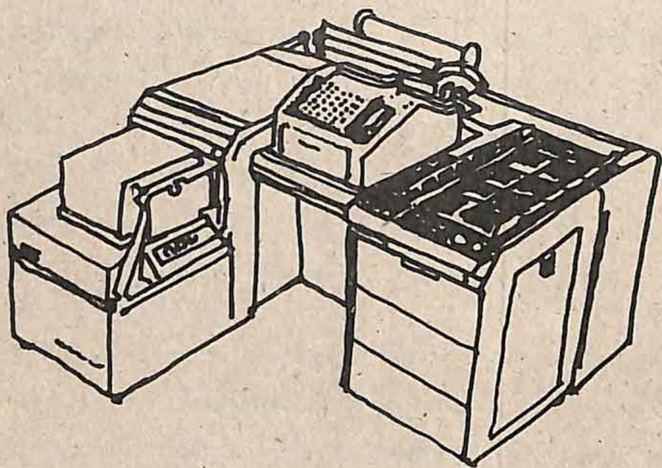

মানবজাতির সেবায় পারমাণবিক শক্তি

অন্যদিকে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে। তাই বিদ্যুৎশক্তির অন্যান্য উৎসের সন্ধানের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এইখানে পারমাণবিক বিজ্ঞান হদিশ দিল যে পরমাণুতে আন্তর্নিহিত তেজকে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের অন্য কাজে লাগানো সম্ভব। যে প্রণালীতে এই শক্তির সৃষ্টি করা হয় তাকে বলা হয় পারমাণবিক রিয়াকটার। এই রিয়াকটার এখন অনেক কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য উৎসের পরিবর্তে অবিরত শক্তির উৎস হিসেবে এর প্রচলন হবে। শক্তির কোন একটা ইন্ধনের উৎস যদি ফুরিয়ে যায় তবে বিপদে পড়ার কোন আশঙ্কা নেই।

আনবিক রিয়াকটার এখন যে সব অভাবনীয় কাজ করছে তার ভেতর উল্লেখযোগ্য হ'ল জাহাজ ও ডুবো জাহাজে শক্তির সরবরাহ। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে আজ আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তির একটি অভিনবত্ব হ'ল এই যে ছোট একটি প্যাকেটের মধ্যে বহুদিন ধরে ব্যবহারের মত প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব। পারমাণবিক ইন্ধনের একটি চার্জের সাহায্যে 1958 সালের আগষ্ট মাসে 'নটিলাস' ডুবো জাহাজটি উত্তর মেরু অঞ্চলের বরফের তলা দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে পৌঁছোয়। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে মহাকাশ যাত্রাও সহজ হ'য়ে উঠবে বলে মনে হয়। চাঁদে ভবিষ্যতে মানুষ বসতি স্থাপন করে, তবে পরমাণু-ই সেখানে শক্তির উৎস হবে।

ক্রমশই পারমাণবিক শক্তির নতুন নতুন ব্যবহার আবিষ্কার হচ্ছে। এটম বোমা থেকে যে পারমাণবিক যুগের সূচনা হ'ল তাতে অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়েছে, আরও অনেক হবে



ইলেকট্রনিক্স্

ইলেকট্রনিক্স্ প্রয়োগ আণবিক বোমা আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই চলছিল। গত কয়েক বছরে এর এত দ্রুত প্রসার হয়েছে যে আমরা একে একটা নতুন জিনিষ বলে মনে করি। শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইলেক্‌ট্রনিকের ব্যবহার আজ সব চাইতে বেশী।

ইলেকট্রনিক্‌স্‌ কাকে বলে যদি আমরা বুঝতে চাই তবে একটি তারে বিদ্যুৎ চালালে কি ঘটে তা আগে আমাদের জানা দরকার। একটি তারের ধাতু অনেকগুলি এটমের সমষ্টি দিয়ে গড়া। আর প্রত্যেক এটমে একটি করে কেন্দ্রক আছে যার চারদিকে ইলেক্‌ট্রনরা দ্রুতগতিতে ঘুরছে।

বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু করলে তারের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি কিছু ইলেকট্রন সমান গতিতে বইতে থাকে। এই প্রবহমান ইলেকট্রন থেকে হীটার, আলো ইত্যাদি কাজ করে।

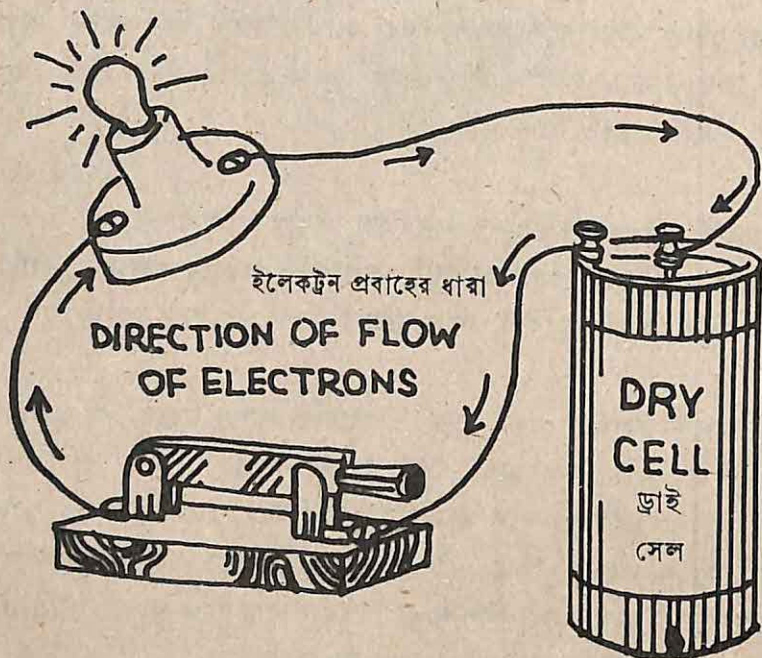
বিদ্যুতের এই প্রবাহে বিচ্ছেদ এনে দিলে কি হয়? যদি ফাঁকটা সামান্য হয় তাহ'লে ইলেকট্রনগুলি লাফিয়ে স্ফুলিঙ্গের আকারে শূণ্যস্থান পেরিয়ে যায়। কিন্তু ব্যবধান বেশী হ'লে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হ'য়ে যায়।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আলোর বাল্বের ভিতর খুব সূক্ষ্মভাবে জড়ানো বা আঁকাবাঁকা একটি তার বা ফিলামেণ্ট থাকে। এই তারের ভিতর দিয়ে যখন বিদ্যুৎ চলে তখন সেটা এত গরম হ'য়ে যায় যে তারটি আলো বিকীর্ণ করে। কিন্তু এই সূক্ষ্ম তারটি ভেঙে গেলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হ'য়ে যায় এবং আলো জ্বলে না। তখন আমরা বলি বাল্বটা "ফিউজ" হয়ে গেছে এবং সেটাকে বদলে অন্য বাল্ব লাগাই।

টমাস আলভা এডিসন (1847-1931) ইলেকট্রিক বাল্বের আবিষ্কর্তা। অনেক চেষ্টার পর ইনি এই আবিষ্কারে সফল হন। 1883 খৃষ্টাব্দে ইনি ফিলামেণ্টের সামান্য দূরে একটি ধাতুর পাত স্থাপন করে একটি বিশেষ

ধরণের বাল্ব তৈরী করেন। এই বাল্বে পজিটিভ চার্জে বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটতো, কিন্তু নেগেটিভ চার্জে তা বন্ধ হ'য়ে যেত।

এডিসন এ বিষয়ে আর কিছু জানবার প্রয়োজন মনে করেন নি বা এই নিয়ে কোন চেষ্টা-ও করেন নি। তিনি বাল্বের উন্নতির বিষয়ে এত মনোযোগ



দিয়েছিলেন যে অন্যদিকে মন দিতে চাননি। পরে কোন কাজে লাগতে পারে শুধু এই ভেবে এই বিষয়টি সম্বন্ধে লিখে রেখে এর একটি পেটেণ্ট করে নেন। তারপর বাল্বটি ড্রয়ারে রেখে ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন।

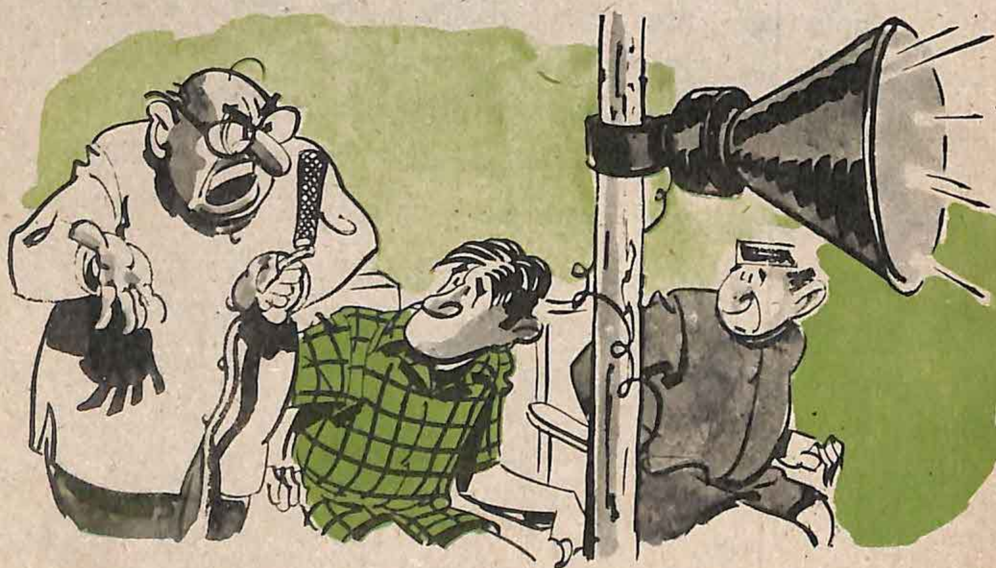
তিনি যে তথ্যটি আবিষ্কার করেছিলেন তাকে 'এডিসন এফেক্ট' বলা হয় ইলেকট্রনের প্রকৃতিটা না জানলে এটা কি তা বুঝতে পারবে না। সাধারণত ইলেকট্রনরা অণুতে সংঘবদ্ধ হ'য়ে থাকে। কিন্তু কোন একটি ধাতুকে যথেষ্ট গরম করলে তার থেকে কিছু ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়। যেমন জল ফোটালে বুদ্বুদ বোরোয় তেমনি উত্তপ্ত তার থেকে ইলেকট্রনের নিষ্ক্রমন হয়। একে বলে থারমিওনিক এমিশন। এডিসনের বাম্বে যে পাতটিকে পজিটিভ চার্জ দেওয়া হ'য়েছিল সেটা গরম তার থেকে বেরোন নেগেটিভ ইলেক্ট্রনগুলোকে আকর্ষণ করে নিয়েছিল। কিন্তু ধাতুর পাতটিকে নেগেটিভ চার্জ দিলে সেটা ইলেক্ট্রনগুলিকে আকর্ষণ করছিল না তাই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছিল।

এডিসন এফেক্ট থেকে দেখা গেল যে ধাতুর পাতে পজিটিভ চার্জ দিলে ফিলামেণ্ট ও পাতের ভেতর বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটে।

অনেক বছর পরে, জন এ্যম্ব্রোজ ফ্লেমিং নামে এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার অধুনা ব্যবহৃত উন্নত ধরনের থারমিওনিক টিউব বা ভালভ তৈরী করেন। ভাল্‌ভের কাজ হ'ল কোন তরল, বায়বীয় বা বৈদ্যুতিক প্রবাহকে ফেরার পথ বন্ধ রেখে এক মুখে চালিত করা। অল্টারনেটিং কারেণ্ট মুহূর্তের ভেতর বহুবার দিক্ পরিবর্তন করে। একে যদি একটি পাতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় তা হ'লে পালাক্রমে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুই ধরনের চার্জই দিয়ে যাবে। কিন্তু থারমিওনিক ভাল্‌ভের মাধ্যমে ধাতুর পাতে শুধু পজিটিভ চার্জ দিলে বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটে এবং নেগেটিভ

চার্জে তা বন্ধ হ'য়ে যায়। তাই ভাল্‌ভের সাহায্যে এখন বিদ্যুৎপ্রবাহকে শুধু একই দিকে চালনা করা সম্ভব হ'ল।

1907 খৃষ্টাব্দে একজন আমেরিকান আবিষ্কারক লী ডি ফরেষ্ট থারমিওনিক টিউবের আরও উন্নতিসাধন করেন। উনি একটি গ্রিড (grid) বা তারের গজকে ফিলামেণ্ট ও ধাতুপাতে না ছুঁয়ে মাঝখানে রাখেন। তাতে টিউবটিকে





এম্‌প্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হ'ল। এর নাম দেওয়া হ'ল অডিয়ন বা ট্রায়োড।

এই হ'ল রেডিও নির্মানের প্রথম ধাপ। 1888 খৃষ্টাব্দে হাইনরিক হার্টজ নামে এক জার্মান বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করলেন যে বিদ্যুৎ ও চুম্বকশক্তি একটি আধার থেকে অন্য আধারে ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক্ বা বেতার প্রবাহরূপে যেতে পারে।

বেতার প্রেরক যন্ত্র বা ট্রান্সমিটার দিয়ে শব্দকে ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গে অনেক দূরে পাঠানো যায়। কিন্তু দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গেই এই তরঙ্গ ক্ষীণ হ'য়ে আসে বলে একে টায়োড এর গ্রিডের সাহায্যে শোনার যোগ্য করে তুলতে হয়। গ্রিডে পজিটিভ চার্জ থাকলে এটা ফিলামেণ্ট থেকে ইলেক্‌ট্রনের প্রবাহ টেনে নেয়। এই প্রবাহ গ্রিডের মাধ্যমে ধাতুপাতে বইতে থাকে। বৈদ্যুতিক চার্জ দুর্বল হ'লে কম ইলেক্‌ট্রন ফিলামেণ্ট থেকে বেরোয় এবং ধাতুপাতেও বিদ্যুৎপ্রবাহ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। প্রকারান্তরে যদি চার্জ বাড়ানো হয় তাহ'লে ফিলামেণ্ট থেকে বেশী ইলেক্‌ট্রন নির্গত হয় এবং ধাতুপাতে বিদ্যুৎপ্রবাহ জোরালো হয়।

এই ভাবে যে দূরের বাণী ধাতুপাতে এসে পৌঁছোয় তার কোন পরিবর্তন হয় না। ফিলামেণ্ট নির্গত ইলেক্‌ট্রনের সাহায্যে তাকে শোনবার উপযোগী করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের ইলেক্‌ট্রনিক টিউব বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এখন এমন অনেক যন্ত্র আছে যাতে শত শত ও অনেক সময় সহস্রাধিক ইলেক্‌ট্রনিক টিউবের ব্যবহারের প্রয়োজন। কিন্তু এই টিউবগুলি ভারী এবং ভঙ্গুর বলে বৈজ্ঞানিকরা এদের বদলে ছোট ও মজবুত কোন বস্তু বার করার চেষ্টায় থাকেন।

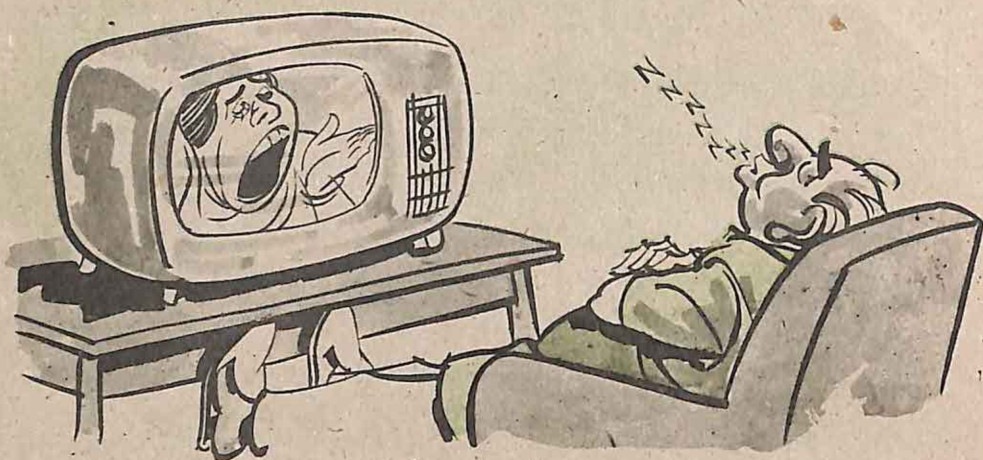
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে আমেরিকায় একদল বৈজ্ঞানিক বেল টেলিফোন ল্যাবরেটারিতে এ বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। এঁদের নাম ওয়ালটার

ব্র্যাটেন, উলিয়ম শক্‌লে, এস্‌. ও. মরগ্যান, জি. এল. পিয়ার্সন ও জন বার্ডীন। 1947 সালে এঁরা ট্রানজিস্টার আবিষ্কার করেন।

সাধারণতঃ পদার্থকে পরিবাহী (conductor) ও অপরিবাহী (non-conductor) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। পরিবাহী বস্তুর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চালন সম্ভব ; যেমন, রূপা বা তামা। কিন্তু কাঁচ বা ব্যাকেলাইট জাতীয় অপরিবাহী বস্তুর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ যেতে পারে না। এ ছাড়া আংশিক পরিবাহী বস্তু, যেমন, সিলিকন ও জারমেনিয়াম সাধারণ অবস্থায় অপরিবাহী, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় এরা ভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করে। যেমন, সামান্য পরিমাণে আর্সেনিক মেশালে জারমেনিয়ামের মাধ্যমে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটানো সম্ভব। কিন্তু এর সঙ্গে গ্যালিয়াম মেশালে বিদ্যুৎপ্রবাহ উল্টো দিকে বইবে।

এই দুই ধরনের ক্রিষ্ট্যালের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকরা রেক্‌টিফায়ার ও এম্‌প্লিফায়ার জাতীয় অনেক জিনিষ তৈরী করলেন যাতে আগে ইলেক্‌ট্রনিক টিউবের প্রয়োজন হ'ত।

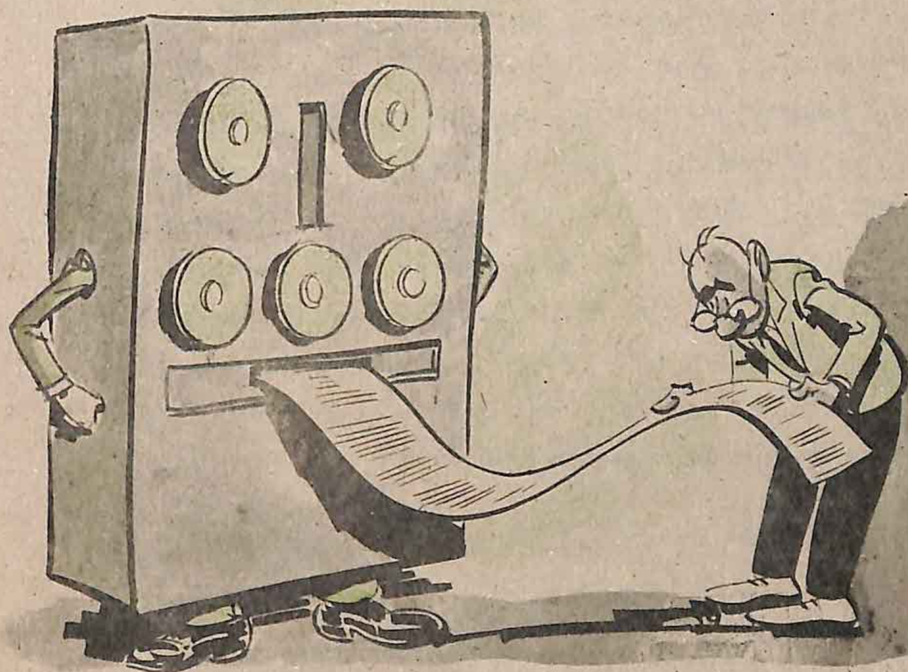
ট্রান্‌জিস্টার আকারে টিউবের শতাংশেরও কম। এতে কাঁচের ব্যবহার না থাকায় অনেক মজবুত। তা ছাড়া থারমিওনিক টিউব গরম হ'তে সময় নেয় আর এর উত্তাপের জন্যে অনেক অসুবিধাও হয়। ট্রান্‌জিস্টার কোন উত্তাপের সৃষ্টি করে না এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ করতে শুরু করে। সর্বোপরি ট্রান্‌জিস্টার অনেক সস্তায় ও সহজে তৈরী করা যায়।



ইলেক্‌ট্রনিকের ব্যবহার পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তন এনেছে। রেডিও থেকে শুরু করে আজ ইলেক্‌ট্রনিক অনেক বড় বড় কাজে লাগছে। আজ সিগারেটের বাক্সের আকারের ছোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এর নাম হার্ট পেস মেকার। অনেক হৃৎরোগগ্রস্থ লোক বুকে এই যন্ত্র লাগিয়ে রাখেন।

ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র বসানো এমন জামাকাপড় তৈরী হচ্ছে যাতে সুইচ টিপে

শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ করা চলে। বাড়ীর দেওয়ালে যন্ত্র বসিয়ে আজ ঘরের ভিতরের তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রাডারের সাহায্যে আজ যে কোন আবহাওয়াতেই দিনে বা রাতে আমরা শত্রুপক্ষের বিমানের সঙ্কেত পাই। ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র দিয়ে ডুবো জাহাজ ও মাছ ধরার জাহাজ থেকে তীরের অনেক ভিতরের গুপ্ত খবর জানা যায়। উপকূল বরাবর বেশ কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে এই ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র বেতার সংবাদ সংগ্রহ করতে



পারে, ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষার ওপর নজর রাখতে পারে, স্থলে ও আকাশপথে যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের হদিস দিতে পারে। লেসার রশ্মির আবিষ্কারও ইলেক্‌ট্রনিকের অবদান। এর সাহায্যে কয়েক মিটার দূর থেকে একটি ধাতুপাতে ফুটো করে দেওয়া যায়। চাঁদের দিকে ফেললে একটি লেসার রশ্মি চার লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চাঁদের গায়ে তিন কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

আধুনিক ইলেক্‌ট্রনিক কম্‌পিউটারকে মানুষের মস্তিষ্কের মত ব্যবহার করা হয়। এদের কৃত্রিম-মস্তিষ্ক, সুপার-ক্যালকুলেটার, থিংকিং মেশিন ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হ'য়ে থাকে।

আধুনিক কম্‌পিউটার যন্ত্র ইলেক্‌ট্রনিকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এ দিয়ে মানুষের চাইতে হাজার গুণ দ্রুতগতিতে হিসেব করা যেতে পারে। এ যন্ত্র কখনও ক্লান্ত হয় না বা ভুল করে না। নিমেষের মধ্যে অনেক হিসেব-নিকেশ ও অনেক কিছুর তুলনামূলক বিচার করে জটিল সমস্যার সমাধান করে দেয়। এর সাহায্যে কাজের নিয়ন্ত্রণ করা চলে এবং কোথাও কোন ভুল বা ত্রুটী হ'লে আগের সিদ্ধান্ত আবার শুধরে নেয়। কম্‌পিউটার প্রায় মানুষের মত কাজ করে। এখন ভয় হচ্ছে যে এ হয়তো মানুষের বদলে কাজ ক'রেই ক্ষান্ত হবে না, একদিন মানুষকেও ছাড়িয়ে যাবে। কম্‌পিউটার যে ভাবে কাজ করে তা খুঁটিয়ে দেখলে মানুষের মনের কর্মধারার কথাই জানতে পারি।

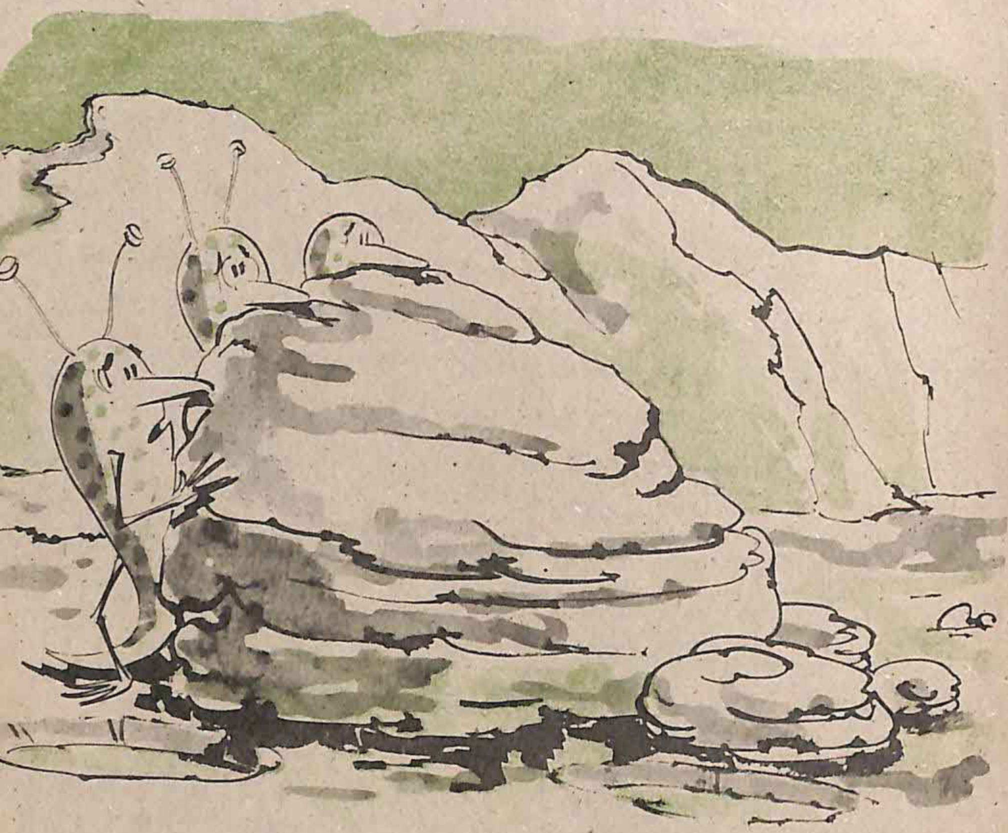
যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্যে যে যে তথ্যের প্রয়োজন তা প্রথমে

কম্‌পিউটারের ইন্‌পুট্‌ ইউনিটে জমা করা হয়। এইভাবে সাজানো সাংকেতিক তথ্যগুলিকে প্রোগ্রাম বলে। এই তথ্যগুলি স্মৃতির কুঠ্‌রীতে সঞ্চিত রেখে কম্‌পিউটার সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে চলে। দরকার মত স্মৃতির কুঠ্‌রী থেকে জমানো তথ্যের সাহায্য নেয়। সমস্যার যে সমাধান পাওয়া যায় তাকে বলা হয় আউট্‌পুট্‌। প্রোগ্রাম ঠিক মত তৈরী করে দেবার পর বাকী সব কাজই কম্‌পিউটারই করে নেয়।

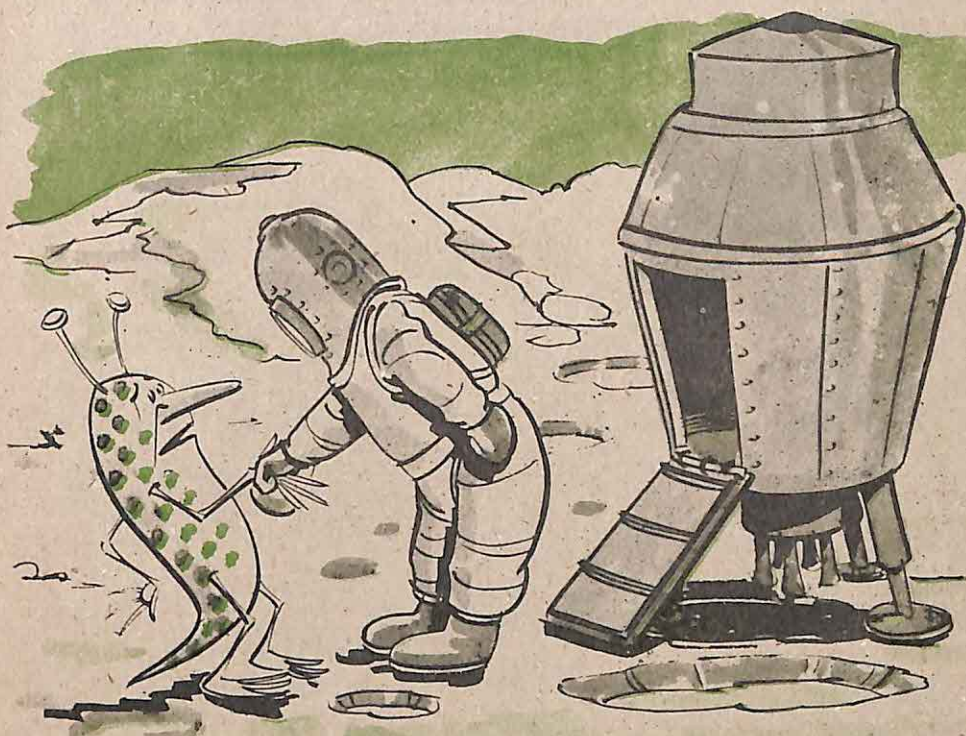
আজ মানুষের প্রায় সব কাজেই কম্‌পিউটার লাগ্‌ছে। শিল্প ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। বিশেষ বিশেষ জায়গায় কোন লোকের সাহায্য না নিয়ে সম্পূর্ণ একটি কাজ এর দ্বারা করা সম্ভব। এর সাহায্যে বৈমানিক ছাড়া বিমান আটলান্টিক পার হয়েছে। কম্‌পিউটার দিয়ে চালক ছাড়া মোটর গাড়ী চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। এটা সম্ভব হ'লে পথে দুর্ঘটনা বন্ধ হবে।

ভবিষ্যতের যুদ্ধে কম্‌পিউটার এবং ইলেক্‌ট্রনিকের ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে চলবে। রণপদ্ধতি থেকে শুরু করে সৈনিকদের সংখ্যা, তাদের অবস্থান, রসদ সরবরাহ, যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্রের পরিকল্পনা কম্‌পিউটারের সাহায্যে হবে। ট্রানজিস্টার দিয়ে তৈরী কম্‌পিউটার মজবুত বলে এগুলো ট্রাকে বা হেলিকপ্‌টারে নিয়ে যাওয়া চলে।

শত শত এমন কি সহস্রাধিক কিলোমিটার দূরে ক্ষেপণাস্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়ে যাওয়া যায় আর শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে উড়ন্ত অবস্থায় নষ্ট করা সম্ভব। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছোবার আগে শব্দের চাইতে দ্রুতগামী ক্ষেপণাস্ত্রকে কম্‌পিউটটার দিয়ে আকাশপথে ধ্বংস করা চলে।



ইলেক্‌ট্রনিকের সাহায্য ছাড়া 1969 সালে আমেরিকান নভোচারীদের এ্যাপোলো 11 ও 12 যানে চাঁদে যাওয়া অসম্ভব হ'ত। অভিযানের প্রতিটি ধাপ আগে থেকে কম্‌পিউটার দিয়ে নির্দ্ধারিত হয় এবং যাত্রাপথেও



ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে সর্বক্ষণ মহাকাশযানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়। যাত্রার পথ, গতি ও চাঁদে অবতরণের খুঁটিনাটি সবই এর সাহায্যে স্থির হয়। পথে কিছু গোলমাল হলে অভিযান স্থগিত রেখে যাত্রীদের

নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার ভারও কম্‌পিউটারের। প্রথম থেকে শেষ অবধি চন্দ্রাভিযান পরিকল্পনাতে ইলেক্‌ট্রনিকের সাহায্য নেওয়া হয়। কম্‌পিউটার করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই।

কম্‌পিউটারকে এখন বই অনুবাদ করতে ও দাবা খেলতেও শেখানো হচ্ছে।

ইলেক্‌ট্রনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং এর আয়তন বিশাল থেকে বিশালতর হ'য়ে উঠছে।